রফিকুল ইসলাম

ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার

রফিকুল ইসলাম

আনন্দ
১৮৮ মতিঝিল সার্কুলার রোড ঢাকা

প্রকাশ
২১শে ফেব্রুয়ারী
১৯৮২

আনন্দ

প্রকাশক
রোকসানা সুলতানা
আনন্দ
১৮৮, মতিঝিল সার্কুলার রোড
ঢাকা

মুদ্রক
আনন্দ মুদ্রায়ণ
১৮৮, মতিঝিল সার্কুলার রোড
ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

বারো টাকা

ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে বিরাশির একুশে ফেব্রুয়ারী ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছর আগে একুশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার রাজপথে একটি বিস্মৃত জাতি নতুন করে তার জাতিসত্তা ফিরে পেয়েছিল এবং তার স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছিল। সে ঘটনা ও তার তাৎপর্যকে বিগত ত্রিশ বছরেও আমরা যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করে উঠতে পারিনি।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর একজন সাক্ষী হিসেবে বিরাশির একুশে ফেব্রুয়ারীতে চেষ্টা করেছি সে ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করে সংক্ষেপে তুলে ধরতে।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর ত্রিশ বছর পরেও বাংলাভাষা প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠেনি, এমন কি স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যেও নয়। বাংলাদেশে আবার বাংলাভাষা সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে ভাষার সংগ্রামে পূর্ব ইতিহাস ও অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে। বায়ান্নর একুশের আবেগ অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমাদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে।

বাংলা বিভাগ রফিকুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অমর একুশের ত্রিশতম বার্ষিকীতে
বাংলাভাষা সংগ্রামে শহীদ
বাংলাভাষা সংগ্রামে নির্যাতিত কর্মী
বাংলাভাষা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী
সকলের উদ্দেশে নিবেদিত

প্রসঙ্গ

একুশের পূর্বকথা/আটচল্লিশ/৯
একুশের ঘটনাপঞ্জী/১৫
সরকার ও ভাষা/৪০
একুশের কবিতা, গান ও সংলাপ/৫৯
একুশের শহীদ ও স্মৃতির মিনার
একটি অপূর্ব ও অপূর্ণ স্বপ্ন/৬৪

চিত্র

একুশের শহীদ ও স্মৃতির মিনার/৮১

একুশের পূর্বকথা/আটচল্লিশ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ বিভাগের সময় ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বালুচী, ব্রাহুই এবং পূর্ব পাকিস্তান বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। দেশ বিভাগের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানেরা ব্যাপক সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং স্বল্পসংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করলে পাকিস্তানে প্রায় শতকরা আড়াই ভাগ উর্দুভাষী নাগরিক সংযুক্ত হয়। কাশ্মীর যুদ্ধের পরে কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানে সংযুক্ত হলে কাশ্মীরী ভাষাও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ সব পরিবর্তনের পরেও সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪৮ সালের শুরুতে পাকিস্তানের মোট ছয় কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জন ছিল বাংলা ভাষাভাষী। অর্থাৎ পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বালুচী, ব্রাহুই, উর্দু, কাশ্মিরী ভাষাভাষীদের মোট সংখ্যার চেয়েও বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা ছিল অধিক। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান গণপরিষদের আইন-বিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে (২৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ও ২রা মার্চ, ১৯৪৮) ১৮৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির ঊনত্রিশ নং উপ-ধারা সংশোধনের জন্যে 'ইংরেজী' ভাষার সঙ্গে 'উর্দু' ভাষার নাম যুক্ত করার সরকারী প্রস্তাবের ওপর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্ত সংশোধনী আনয়ন করেন :

> ২৯ নং উপ-ধারায়, দ্বিতীয় চরণে 'ইংরেজী' শব্দটির পরে 'অথবা বাংলা' শব্দ সংযোজন করা হোক।

এই সংশোধনীর সমর্থনী ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে বলেছিলেন:

> রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত? রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সেই ভাষারই হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে, এবং...আমি মনে করি যে, বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রের লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা......যদি ২৯ নং বিধিতে ইংরেজী ভাষা সম্মানজনক স্থান পেতে পারে—যদি পরিষদের কার্যাবলী উর্দু অথবা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে চলতে পারে তাহলে বাংলা, যা চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের ভাষা কেন সম্মানজনক স্থান পাবে না...

কাজেই বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়, এ ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষারূপে বিবেচনা করা উচিত, সুতরাং......আমি প্রস্তাব করি যে, ২৯ নং বিধিতে 'ইংরেজী' শব্দটির পরে 'অথবা বাংলা' কথাটি যোগ করা হোক।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রবল সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দীন খান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন, এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান পরিষদে বলেনঃ

উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের দাবী অনুসারে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে এবং দশ কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু,...... পাকিস্তান একটি মুসলমান রাষ্ট্র এবং কেবলমাত্র মুসলমান জাতির ভাষাই পাকিস্তানের 'লিঙগুয়া ফ্রাংকা' হতে পারে।......উর্দুই একমাত্র ভাষা যা পূর্ববঙ্গ বা পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের মানুষকে যুক্ত রাখতে পারে। একটি জাতির একটি মাত্র ভাষাই থাকতে পারে এবং কেবলমাত্র উর্দুই সে ভাষা হতে পারে, অন্য কোন ভাষা নয়।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের "দশ কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু," বাক্যটি কৌতুকপ্রদ। ১৯২১ সালের আদম শুমারিতে ভারতীয় মুসলমানদের ভাষাতাত্ত্বিক যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকেই প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি ও তথ্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী অগ্রাহ্য হবার ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার স্থান না হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা শহরের ছাত্রসমাজ ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রভাষা দিবস প্রতিপালন করে। বাংলা ভাষার দাবীতে এইভাবেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। ঐদিন ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ, ঘন ঘন ফাঁকা গুলী ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং ভাড়াটে গুন্ডাদের আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হয়। নেতাদের মধ্যে ছিলেন, শামসুল হক, শওকত আলি, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। কিন্তু এই দমননীতির ফলে ছাত্ররা দমে পড়েনি বা আন্দোলনে ভাটা পড়েনি। তারা প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনে (বর্তমান জগন্নাথ হল মিলনায়তন), বর্ধমান হাউসে প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবনে (বর্তমান বাংলা একাডেমী), হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েটের

সামনে প্রতিদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল ও শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদকে পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন জিওসি ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খানের নির্দেশে মেজর পীরজাদা একদল পদাতিক সৈন্য নিয়ে ছাত্র দ্বারা ঘেরাও পরিষদ ভবন থেকে খাজা নাজিমউদ্দীনকে বাবুর্চিখানার মধ্য দিয়ে বাইরে পাচার করে। (দ্রষ্টব্য, আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় বন্ধু' পৃঃ ৩৮-৩৯) শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা জয়লাভ করে, ১৫ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে নিম্নোক্ত চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষর করেন কামরুদ্দীন আহমদ।

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্যে যে-দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমই শিক্ষা দান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

উপরোক্ত চুক্তিপত্রটিতে বাংলা ভাষা আন্দোলন দমন করার জন্যে সরকারী দমননীতির তথা গ্রেফতার, পুলিশী অত্যাচার, সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ১৪৪ ধারা জারি এবং বাংলা ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত আখ্যা দানের পরোক্ষ স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যাই হোক চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হবার আগে সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে বন্দী ছাত্রনেতা শামসুল হক, শওকত আলি, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব ও শেখ মুজিবুর রহমানকে চুক্তিপত্রটি দেখিয়ে তাদের সম্মতি নিয়ে আসেন। ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় বন্দী ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু ১৬ই মার্চেও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে পুকুর ধারে সাধারণ ছাত্র সভার পরে ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে পরিষদ ভবনে যায় এবং পরিষদ ঘেরাও করে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এই বিক্ষোভকারীদের ওপরেও পুলিশ প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে।

২

খাজা নাজিমুদ্দীন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার মাত্র ৪ দিন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৭ মাস পরে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা সফরে আসেন এবং ২১শে মার্চ তারিখে ঢাকা ঘোড়-দৌড় ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এই সভায় তিনি যে স্পষ্ট ঘোষণা দেন তার বাংলা অনুবাদ ঃ

> কিন্তু এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোন ভাষা নয়। যদি আপনাদের কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে সে হবে পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ছাড়া, কোন জাতিই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে ও টিকে থাকতে পারে না।.........সুতরাং রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২৪শে মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনী ভাষণে তাঁর মতামতের পুনরাবৃত্তি করে যা বলেছিলেন, বাংলায় তার সারাংশ ঃ

> কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রভাষাই থাকতে পারে। যদি এই রাষ্ট্রের গঠনকারী অংশসমূহ ঐকবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সেই ভাষা, আমার মতে কেবল উর্দুই হতে পারে।

পাকিস্তানের অবিসংবাদী নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐ ঘোষণা উপস্থিত ছাত্রদের প্রতিবাদসূচক 'না' 'না' ধ্বনি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ২৪শে মার্চ ১৯৪৮ ভাষা আন্দোলনের নেতা শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, তাজউদ্দিন আহমদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অলি আহাদ সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধিদল জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। জিন্নাহ সাহেব এই দাবী অগ্রাহ্য করেন।

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র ঐ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ১৫ই মার্চ' ৪৮-এর চুক্তিটি কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের এবং উল্লিখিত চুক্তির ৩ ও ৪ নং ধারার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে ইংরেজী ও উর্দু ভাষার সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া সেখানে ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব দুটিতে তার কোন উল্লেখই ছিল না; বরং বাংলাকে নির্ভেজাল প্রাদেশিক ভাষারূপে ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব দুটির বঙ্গানুবাদ ঃ

> (ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থানে বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হবে, এবং বাস্তব অসুবিধাসমূহ যখন দূর করা যাবে তখন এটা কার্যকর করা হবে।
>
> (খ) পূর্ববাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মাধ্যম হবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা।

লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহে বাংলা ভাষাকে কেবলমাত্র প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদাদানের কথা বলা হয়েছিল, তা-ও 'বাস্তব অসুবিধাসমূহ যখন দূর করা যাবে তখন'। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মাধ্যমও পরিপূর্ণরূপে বাংলা ভাষাকে করার কথা ছিল না। 'প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা' অর্থাৎ মোহাজেরদের

স্কুলে উর্দুকে মাধ্যম রাখার ব্যবস্থা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে ৯ই মার্চ, '৪৯ পূর্ব বাংলা সরকার নিয়োজিত 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি'র ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০-এ পেশকৃত রিপোর্টের নিম্নোক্ত সুপারিশটিও তাৎপর্যপূর্ণ :

> পূর্বপাকিস্তানের মাধ্যমিক এবং উচ্চতর স্তরে উর্দু দ্বিতীয় ভাষারূপে পঠিত হওয়া উচিত যাতে আমরা পাকিস্তানের দুই অংশের ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ঘনিষ্ঠ এবং গভীরতর করতে পারি।

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের ভাষানীতি ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান নয় বরং বাংলা ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৪৮ সালে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে ইসলামী আদর্শের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যবাহী ও বিজ্ঞানসম্মত লিখন-প্রণালী পরিবর্তন করে আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন এবং তদনুযায়ী ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 'কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড' পাকিস্তানের সব ভাষার লিখন-প্রণালী আরবী হরফ করার জোর সুপারিশ করে। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের সব লিখন-প্রণালীই আরবী হরফে সুতরাং প্রস্তাবটির লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তন করা। ঐ নীতির পরিপ্রক্ষিতে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলায় আরবী হরফে বয়স্কদের প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা-দানের জন্যে বিশটি কেন্দ্র চালু করে এবং বেশ কিছুকাল ধরে উদ্ভট প্রয়াসের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়।

১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি গঠিত হয়েছিল, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০ পেশকৃত তার রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ ছিল। বলা বাহুল্য, মূল নীতি-নির্ধারণ কমিটির অগণতান্ত্রিক এবং পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক রিপোর্ট পূর্ব বাংলার মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর, ১৯৫০, ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য যে পাল্টা সুপারিশসমূহ পেশ করা হয় তাতে বলা হয়েছিল 'পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু'। ১৯৫১ সালের ১৬ই ও ১৭ই মার্চ তারিখে কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহবান জানান, কারণ তা তাঁর মতে 'বাঙালীদের গণহত্যার সামিল'।

একুশের ঘটনাপঞ্জী

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা'। খাজা নাজিমুদ্দীনের ঐ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০শে জানুয়ারী ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়, ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির উদ্যোগে পুরাতন কলা-ভবন প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মঘট ও সভা থেকেই বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরু। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অস্থায়ী অর্গানাইজিং কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে। এই কমিটির উদ্যোগে ১৯৪৯,৫০ ৫১ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস রূপে পালিত হয়েছে। খাজা নাজিমুদ্দীনের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কমিটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং এই কমিটির উদ্যোগেই বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরু। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি বা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সমস্যা পর্যালোচনার জন্য ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বার লাইব্রেরী হলে এক সর্বদলীয় কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, ঐ কর্মী সম্মেলনের নিম্নোক্ত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়ঃ

> রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য সভায় ৪০ জনের উপর সদস্য লইয়া একটি সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুবসংঘ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের সমিতির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তৃতা করেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নওয়াজ খান, পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, অধ্যাপক খায়রুল বাশার, ইডেন কলেজের ছাত্রী মিসেস মাহবুবা খাতুন।......

'আজাদ' পত্রিকার উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কাজী গোলাম

মাহবুব এই কর্মপরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন। সর্বদলীয় কর্মপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের নাম 'আজাদের' উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়নি। খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে (হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত) লিখেছেন, ৩০শে জানুয়ারী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

> আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, খিলাফতে রব্বানী পার্টি, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'একজন প্রতিনিধি এ কমিটিতে নেয়া হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন। তা ছাড়া এ কমিটিতে ছিলেন ঃ জনাব আবুল হাশেম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ। এই কমিটি প্রথম সভাতেই স্থির করে, সভা-শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা প্রদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ঐ দিবসের কর্মসূচী সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালন, শোভাযাত্রা ও ছাত্র-জনতার মিলিত সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ২৬শে জানুয়ারীর ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য ৩রা জানুয়ারী ঢাকা গভর্নর হাউসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি এ সম্পর্কে কেবলমাত্র 'কায়েদে আজম' মরহুমের উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন— চূড়ান্তভাবে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র গণ-পরিষদেরই আছে।' রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত কি এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কায়েদে আজমের নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী তবে গণ-পরিষদই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।' কিন্তু খাজা সাহেবের ঐ বিবৃতির পরেও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এ সম্পর্কে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২, 'আজাদ' পত্রিকায়, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ, সোমবারে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত ঃ শোভাযাত্রা সহকারে দশ সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর শহর প্রদক্ষিণ' শিরোনামে নিম্নোক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ঃ

> উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রচলন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গতকল্য (সোমবার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট পালন করেন। জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভা হয়।..... ছাত্র-ছাত্রীগণ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'আরবী হরফে বাংলা লেখা চলবে না' প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন।

৩

৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবসের পরে ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী সাফল্যের সঙ্গে পতাকা দিবস পালিত হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবী সম্বলিত ব্যাজ বিক্রয় করে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ইতিমধ্যেই ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নুরুল আমীন সরকার একমাত্র সরকার-বিরোধী ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা ধর্মীয় অজুহাতে নিষিদ্ধ করে দেয়। পত্রিকা মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ও সম্পাদক আবদুস সালামকে গ্রেফতার, জামিন দান ও জামিন নাকচ করে হয়রানি করা হয়। ইতিমধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতেও আন্দোলন গড়ে ওঠে, দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় ২১শে ফেব্রুয়ারীতে 'শেখ মুজিবুরের অনশন ধর্মঘট' শিরোনামে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়,

> পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দফতর প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে বলা হইয়াছে যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান, মহীউদ্দীন আহমদ জেলখানায় অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন।...... গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১-২০ মিঃ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব মোখলেছুর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব মহীউদ্দীন ও অন্যান্য রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানানো হয়।

জনাব গাজীউল হক জানিয়েছেন যে, তাঁকে আহবায়ক করে বন্দী মুক্তি আন্দোলনের জন্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়, পরে সে কমিটি ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস

পালনে সাধারণ ধর্মঘটের ডাকে বিচলিত হয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্যে ১৪৪ ধারা জারী করে সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। সভার বিবরণী ও সিদ্ধান্ত ঃ

> অধিকাংশ সদস্যই পরেরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার মত দিলেন। একমাত্র যুবলীগ নেতা অলি আহাদ যে কোন পরিস্থিতিতে পূর্ব কর্মসূচী বহাল রাখার পক্ষে মত দিলেন।...... কিন্তু সভা শেষ হওয়ার আগেই বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের মনোভাব জানাতে এল ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ ঃ ছাত্রগণ আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে, এটা ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত। এ সম্পর্কে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ছাত্ররা এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সর্বদলীয় পরিষদের রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন। কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন ঃ কমিটির পক্ষ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার যৌক্তিকতা বোঝাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু ছাত্ররা যদি তা মেনে না নেয় তবে এ সর্বদলীয় কমিটি তখন থেকেই বিলুপ্ত হবে।

'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে কবিরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ

> এতদসত্ত্বেও উক্ত সভায় অধিকাংশ সদস্যই সরকারী দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং অবশেষে ১১—৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় পনেরজন উপস্থিত ছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছেন তাদের নাম জানা যায় গাজীউল হকের কাছ থেকে, তিনি আমাকে বলেছেন, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও মেডিক্যাল কলেজের গোলাম মওলা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন, অন্য এগারজন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে ভোট দেন।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তে ছাত্র সমাজে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং পরের দিনের কর্মসূচী সম্পর্কে কিভাবে বিশে ফেব্রুয়ারী রাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, গাজীউল হকের লেখায় তার বিবরণ আছে ঃ

সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রতিটি ছাত্রাবাস মুখর। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাত ১টায় ঢাকা হলের পুকুরের পূব ধারের সিঁড়ির উপর ১১ জন ছাত্র নেতার বৈঠক বসলো। সংক্ষিপ্ত বৈঠক। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তঃ ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ছাত্রনেতা কারা ছিলেন? গাজীউল হকের কাছ থেকে জানা যায়, তিনি ছাড়াও ঐ রাতের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, হাবিবুর রহমান শেলী (পরবর্তীকালে বিচারক), কমরুদ্দীন শহুদ (পরবর্তীকালে অধ্যাপক), এম, আর আখতার মুকুল (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরম পত্র' খ্যাত), জিল্লুর রহমান (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), আবদুল মোমেন (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা ও মন্ত্রী), এস, এ, বারি এ, টি; (পরবর্তী কালে ন্যাপ নেতা ও মন্ত্রী) মোহাম্মদ সুলতান (প্রকাশক, একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন ১৯৫৩) আনোয়ারুল হক (ফজলুল হক হলের তদানীন্তন জি, এস)। বৈঠকে আনোয়ার হোসেন নামে একজন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের লোক। একুশে ফেব্রুয়ারীতে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ধর্মঘটের পরে ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে সমবেত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে সারারাত ধরে বাংলা ভাষার দাবী ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সপক্ষে অসংখ্য পোস্টার লেখা হয়েছিল, সেগুলোও কলাভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দেখা যায়। সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীতে ভরে যায়, তারপরে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় বারটার দিকে। ঐ সভা প্রসঙ্গে খোন্দকার গোলাম মোস্তাফা লিখেছেন:

> এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছাত্র-জনতা অতঃপর আমতলায় সমবেত হলো। গাজীউল হক সে মহতী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্ররা শামসুল হকের বক্তব্য শুনলো, কিন্তু তারা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হল না। তারা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে কড়া পুলিশ পাহারা। এ সময়ে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আবদুস সামাদ একটি আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ছাত্ররা দশজন করে বের হবে।......ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব মেনে নিল।

বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে ঢাকা শহরের অবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আমতলার গুরুত্বপূর্ণ সভা সম্পর্কে কবিরউদ্দিন আহমদ লিখেছেন ঃ

কর্মীদের প্রচেষ্টায় শহরের সকল অঞ্চলের দোকানপাট, গাড়ী-ঘোড়া, যান-বাহন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২টার মধ্যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে হাজির হল। প্রায় সাড়ে বারটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হল। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায় ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সংকটজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপরই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি তার সহকর্মীগণসহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

তার সহকর্মীদের অন্যতম ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা দশজনের অংসখ্য দলে বিভক্ত হয়ে লাইন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারের নীচে গেট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তারপর দশ জনের এক একটি দল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে গেট অতিক্রম করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে থাকেন এবং প্রচণ্ড পুলিশী হামলার শিকার হন। পুলিশ প্রচণ্ড লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ ও ফাঁকা গুলী বর্ষণ করতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে তারা কলাভবন প্রাঙ্গণেও প্রবেশ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা কলাভবন, লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আবার নবোদ্যমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে এগিয়ে যায়—, এ ভাবে অসংখ্য ছাত্র গেফতার হয়।

১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী ছাত্রদের প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন ছাত্রনেতা হবিবুর রহমান শেলী, দ্বিতীয় দলের আবদুস সামাদ ও ইব্রাহিম মোঃ তাহা, তৃতীয় দলে আনোয়ারুল হক ও ওবায়েদুল্লা, পঞ্চল দলটি ছিল ছাত্রী-দের—দশজন ছাত্রীর যে দলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তাদের মধ্যে ছিলেন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সাফিয়া খাতুন, রওশন আরা, তারা মেডিক্যাল

কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই তাদের গ্রেফতার ও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। কলাভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতি গাজীউল হকের কাছে একটি টিয়ার গ্যাস শেল এসে পড়লে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। জুলমাত আলি খান এবং অপর কয়েক জন ছাত্রনেতা তাকে ধরাধরি করে দোতলায় কলতলায় নিয়ে যান, সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ হালিম, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও অন্যান্যদের সেবাযত্নে তিনি জ্ঞান ফিরে পেলে শামসুল হক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন 'আমরাও এ আন্দোলনের সাথে আছি।' একুশে ফেব্রুয়ারী দুপুরে কলাভবন ও মেডিক্যাল কলেজ অঞ্চলের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে খোন্দকার গোলাম মোস্তফা লিখেছেন ঃ

> দশজন করে ছাত্র বের হতে লাগল আর পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে লাগল। এইরূপ পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। কাঁদানে গ্যাসের এক একটি শেল ছাত্রদের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল। এরপর পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র পুলিশের এ যুদ্ধের স্থান বদলে গেল। মেডিক্যাল কলেজ গেট, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল, ও তার চারদিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষ। এসব স্থানে বেপরোয়া লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে বহু ছাত্র, আহত হয়।

৪

একুশে ফেব্রুয়ারী দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এলাকায় যারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিলেন এবং যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে কবিরউদ্দিন আহমদ লিখেছেন ঃ

> সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে দশজনী মিছিল বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগান দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আই, বি ও পুলিশ বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম 'দশজনী মিছিল' শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেফতার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে। দেখতে দেখতে অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে অনেকগুলো ট্রাকে করে তাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও

ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তখন কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ল রাস্তার পাশে আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই আবার কাঁদানে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববি-দ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বেলা প্রায় ২টা পর্যন্ত মিছিল করে করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতার বরণ করতে থাকে। আর ধীরে ধীরে তারা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেট দিয়ে জমায়েত হতে থাকে।

একুশে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে অংশ গ্রহণকারী শামসুল বারী (মিয়া মোহন), বর্তমানে একজন আইনজীবী, সেদিনকার ছাত্রী মিছিলে পুলিশের হামলা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার যে পরিচয় আমাকে লিখিতভাবে দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

……মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়া হল। প্রতি দলে দশজন যাবেন। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দলকে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পঞ্চম দলে ছিলেন কয়েকজন ছাত্রী, আমরা ছিলাম ষষ্ঠ দলে। মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব গেটের দিকে সোজা যেতে জনৈক সার্জে-ন্টের আদেশে কয়েকজন পুলিশ লাঠি আড়াতাড়িভাবে মেয়েদের বুক সোজা ধরলে সামনের দলের কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে গিয়ে লাঠি কেড়ে নেয়, আর তখন বাঁশী বাজার সাথে সাথে বেপ-রোয়া লাঠি চার্জ হয়। মেয়েরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। আমরা উত্তর দিকে পরিষদ ভবনের উদ্দেশ্যে কখনো ডানে-বায়ে পাশ কেটে, কখনো লাঠির নীচ দিয়ে ডুব দিয়ে পরিষদ ভবনের কোণে চৌরা-স্তায় পেঁাছে দেখি মেশিনগান পাতা হয়েছে এবং তখনই শুরু হয় টীয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়া, সাথে সাথে লাঠি চার্জ।……

ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা লংঘন করে পথে বেরিয়ে এলে এবং প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ যখন তাদের ওপর প্রচণ্ড কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ, বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও পাই-কারী গ্রেফতার শুরু করে তখন মেডিক্যাল কলেজের ওয়ার্ড বয়, বেয়ারা, মেডিক্যাল হোস্টেলের (বর্তমান যেখানে ডিসপেনসারী, শহীদ মিনার ও নার্স হোস্টেল)-সংলগ্ন রাস্তার পাশে হোস্টেল, রেস্টু-রেন্টের (এখন সেগুলো নেই) বয় বেয়ারার, পথচারী, রিকশাওয়ালা প্রমুখ তাদের সঙ্গে যোগদান করে। ফলে এ আন্দোলন ছাত্র জনতার

সম্মিলিত সংগ্রামে রূপান্তরিত হয় এবং তারা সম্মিলিতভাবে পুলিশী জুলুমের শিকার হয়। স্মরণীয় যে, বর্তমানে যেখানে ডিসপেনসারী, শহীদ মিনার ও নার্স হোস্টেল সেখানে সেকালে সারি সারি মুলি বাঁশের ব্যারাকে ছিল মেডিক্যাল হোস্টেল। মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের কোণে ওয়াটার সাপ্লাইর সাব স্টেশনটির নিকটে রাস্তার মোড়ে সেদিন পুলিশ তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। পরিষদ ভবনে (বর্তমান জগন্নাথ হল মিলনায়তন) যাবার পথে ই, পি, আর মেশিনগান পোস্ট ও কাঁটাতারের ব্যারিকেড বসিয়েছিল। ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রা মেডিকেল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে বার বার সেই ব্যারিকেড অতিক্রম করে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষার দাবী পেশ করার জন্যে পরিষদ ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করছিল। অপরাহ্নে এই সময়েই হঠাৎ গুলি চলে।

একুশে ফেব্রুয়ারীতে গুলির প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ঐ দিনই সন্ধ্যায় প্রকাশিত 'আজাদ' পত্রিকার টেলিগ্রাম এবং বাইশে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায়। প্রথম পৃষ্ঠা 'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ' বড় বড় হরফের এই শিরোনামে এবং 'বিশ্ববিদ্যালষের ৩জন ছাত্রসহ চার বক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত, হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা অশঙ্কাজনক, স্কুলের ছাত্রসহ ৬২ জন গ্রেফতার......' প্রভৃতি উপ-শিরোনামে ২২শে ফেব্রুয়ারী 'আজাদে' প্রকাশিত বিবরণটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

> গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকাল প্রায় ৪ টার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (২৬) ঘটনাস্থলেই নিহত এবং বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত্রি ৮টার পর আহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জব্বার (৩০) আবুল বরকত (২৫) ও বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকউদ্দিন আহমদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।......
>
> পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিবার জন্যে ছাত্রদল পরিষদ ভবনের দিকে যাইতে চাহিলে হঠাৎ একদল পুলিশকে হোস্টেল

অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে দেখা যায় এবং তাহারা হোস্টেলের বাহিরে ও ভিতরে গুলী চালাইতে থাকে। ছাত্রগণকে এই সময় ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে ও আড়ালে আত্মগোপন করিতে দেখা যায়। গুলী বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলের ভিতর একটি মোড়ের বারান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সালাউদ্দীনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি বুলেট তাহার কপালে বিদ্ধ হইয়া মাথার খুলি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রচুর রক্তে ১২ নম্বর শেডের বারান্দার প্রশস্ত অংশ রঞ্জিত হইয়া উঠে। বহু ছাত্রকে আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় ২০ নম্বর শেডের বারান্দা ও হোস্টেল প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কয়েকটি বুলেট ২১ নম্বর শেডের দেওয়াল ভেদ করিয়া কামরার মধ্যে প্রবেশ করে।......কয়েকটি কামরায় রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়।

শহীদ সালাউদ্দীনের লাশ মেডিক্যাল কলেজের এ্যাপ্রনপরা পুরুষ নার্স ও ওয়ার্ড বয়রা এম্বুলেন্সে করে তুলে নিয়ে আসেন, তার লাশ নামান হয় মেডিকেল কলেজের মাঝখানের গেটের গাড়ী বারান্দায়। নার্স ও ওয়ার্ড বয়রা ক্রোধে চীৎকার করে প্রতিশোধের দাবী তুলে শ্লোগান দিতে দিতে স্ট্রেচারে করে লাশটি গাড়ী থেকে বারান্দায় নামালে এক বীভৎস ও করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বুলেটে উড়ে যাওয়া সালাউদ্দীনের খুলি থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, গলিত মগজ বেয়ে পড়ছে। সেখানে উপস্থিত ছাত্র নেতা কাজী গোলাম মাহবুব, সৈয়দ কমরুদ্দীন (শহুদ) এবং আরো অনেকে ঐ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এম্বুলেন্সটি সালাউদ্দীনের রক্তাক্ত দেহ নামিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে যায় আহতদের তুলে আনতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম, এ ২য় পর্বের ছাত্র আবুল বরকত গুলীবিদ্ধ হলে তাকে যারা মেডিক্যাল হোস্টেল থেকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসেন তাদের একজন, সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী শামসুল বারী (মিঞা মোহন) একুশের মেডিকেল হোস্টেলের পরিস্থিতি ও বরকতের গুলীবিদ্ধ হবার যে লিখিত বিবরণ আমাকে দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

আমরা অনেকেই আঘাত পেলাম এবং লাঠি ও চাপে বিপন্ন হয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের তারকাটার বেড়ার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমি ২০ নং ব্যারাকে আঃ সালাম চৌধুরীর ঘরের সামনে শফিকুর রহমান এর দেখা পেলাম। এ সময়ে পুলিশ হোস্টেল

গেট ঘেরাও করে দাঁড়ায়, তারা আমাদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য টীয়ার গ্যাস শেল ছুঁড়তে আরম্ভ করল। চোখের জ্বালা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা হাঁড়ি কলসী সংগ্রহ ক'রে তাতে পানি রেখে রুমাল ভিজিয়ে নিলাম। ব্যারাকের বারান্দায় আমরা ও বয়-বাবুর্চি'রা ইট ভেঙে জমা করে পাহারায় রইলাম, যাতে পুলিশ ভেতরে ঢুকতে না পারে। ব্যারাকের বাঁশের চালার মধ্যে শেল ঢুকছিল, আবার কেউ-কেউ শেল ফাটাবার আগেই ধরে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারছিলেন। ওদের কাছে পানি না থাকায় ওরা ছুটে যাচ্ছিল উত্তরদিকে আবার একটু পরেই ফিরে আসছিল দ্রুত বেগে। এমনি ধারা চলছিল ঘণ্টা দুই তিন ধরে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে তখন অনেক ছাত্র এসে গেছে, আটকা পড়ে গেছি সবাই বুলেট আর ইটের লড়াইয়ে। কারো চোখে ভীতির চিহ্ন নেই—আছে ঘৃণা আর উন্মত্ততা, প্রতিশোধের শ্লোগান, আর শ্লোগান বাংলা ভাষার দাবীতে। ছাত্র সবাই কারিগরী, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কলা সবাই লড়ছি ইট দিয়ে, কোনক্রমেই পুলিশদের হোস্টেল চত্বরে আসতে দেয়া হবে না। প্রতিরোধ ভাঙবার জন্য বার বার তারা চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। সিগ্রেট ধরিয়ে ২০ নং ব্যারাকের মাঝামাঝি কামরায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছিলাম। আমার দিকে এগিয়ে এলেন বরকত, ডাকলাম, আবাই। বীরভূম জেলার সিউড়ির সৈয়দ জাকির সাহেবের আত্মীয়, জাকির সাহেবের ফরিদপুরের চাকুরীকালে আবাই মামুর সাথে পরিচয়। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি কিন্তু পড়ে গেলেন সাথে সাথে আমার হাতখানেক দূরে। পুলিশ ঢুকে পূর্ব থেকে সোজা গুলী ছুঁড়ছে। সফিকুর রহমান (বর্তমানে লণ্ডনে ডাক্তারী করেন) ১৭ নম্বরে থাকতেন, দৌড়ে এসে পানি ঢেলে দিলেন, ভেবেছিলেন টীয়ার গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। আমি গুলীর কথা বললাম, ততক্ষণে পানির সাথে রক্ত দেখা দিয়েছে বারান্দার মেঝেতে। তলপেটে লেগেছে গুলী। গায়ে ছিল তার নীল রংয়ের ফ্লাইং হাফ সার্ট, পরনে খাকী প্যাণ্ট, পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডেল। তখন তার দুই ঠ্যাং শফিকুর রহমান কাঁধে তুলে নিলেন আর মাথা নিলাম আমার কাঁধে। আমরা পশ্চিম দিক দিয়ে একটু ঘুরে দৌড়াতে লাগলাম তার দীর্ঘ সুঠাম দেহটা নিয়ে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তারও কোমর নীচের দিকে ঝুলে দুমরে টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত ঝর-ছিল। আমার কাছে পানি চাইল কিন্তু কোথায় পানি, সময় নাই,

পুলিশ দেখলে কেড়ে নিতে পারে, তাই পড়ি মরি করে ছুটছি। ভেজা রুমালটা দিলাম চুষতে। হোস্টেলের পায়খানাগুলোর কাছ দিয়ে হাসপাতালে যাবার যে ছোট গেটটা ছিল তার কাছে আসতে দু'তিনজন এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে, আমি আমার কাঁধ দিলাম তার কোমরে। সে বল্ল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, বাঁচব না, বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টনে সংবাদ পেঁছে দেন'।

তাকে নিয়ে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে নামলাম। কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। একজন নার্স 'কাপুরুষ' বলে গালাগালি দিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য গেটে যেতে বল্লেন। আমি দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই স্ট্রেচারে করে একজনকে মৃতদেহ আনতে দেখলাম। মাথার খুলি উড়ে গেছে। নীচের দিকে খানিকটা ঘিলু ঝুলছে। শুধু দাঁতগুলি দিয়ে হাসছে যেনো আমাদের দিকে তাকিয়ে।...... আমার তখুনি মনে হল বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে সংবাদ দিতে হবে। সেই সময়ে সেখানে এলেন রফিকুল ইসলাম—রেলওয়ে ডাক্তার সাহেবের ছেলে। তাকে বললাম, একটা সাইকেল জোগাড় করে বা যে করেই হোক সংবাদটি পেঁছে দিতে বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে......

'আজাদ' পত্রিকার ২২শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একুশে ফেব্রুয়ারীতে গুরুতরভাবে আহত ১৭ জনের তালিকা প্রকাশিত হয়। তারা ছিলেন, ১। আনোয়ারুল এছলাম (২৪) এস, এম, হল ২। এ আর ফৈয়াজ (১৯) জগন্নাথ কলেজ ৩। সিরাজুদ্দিন খান (২২) ঢা, বি ৪। আবদুস সালাম (২৭) শুল্ক বিভাগের পিওন ৫। এম, এ মোতালেব (১৪) ৬। এলাহী বখশ (৪০) ৭। মনসুর আলি (১৬) ৮। বছির উদ্দিন আহমদ (১৬) ৯। তাহজুল এছলাম (১৯) ১০। মাসুদুর রহমান (১৬) ১১। আবদুস সালাম (২২) ১২। আখতারুজ্জামান (১১) ১৩। এ, রাজ্জাক (১৭) ১৪। মোজাম্মেল হক (২৩) ১৫। সুলতান আহমদ (১৮) ১৬। এ, রশিদ (১৪) ১৭। মোহাম্মদ।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোটে গুলীতে তিনজনের মৃত্যু ও নয় জনের আহত হওয়ার সংবাদ স্বীকার করে লেখা হয়ঃ

> ......মারমুখী জনতা পুলিশের দিকে ধাবিত হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়া হয়। অতঃপর গুলি ছোঁড়া বন্ধ করা হয়। কিন্তু উহাতেও ছত্রভঙ্গ না হইয়া জনতা পুনরায় পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, ফলে আরও

কয়েক রাউন্ড গুলী ছোঁড়া হয়। উহাতে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। সরকার দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন এবং গুলীর আঘাতে যে নয় ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তন্মধ্যে দুইজন রাত ৮ টায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সরকারের হাতে যে সকল সংবাদ আছে, তাহাতে জানা যায় যে, বে-আইনী কার্যকলাপের দরুণ আজকের অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এমন একদল লোক, বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যাহাদের যোগাযোগ নাই।

সরকারী প্রেসনোটে নিহত ও আহতদের সংখ্যা কম করে দেখান হয়। সরকার ভাষা আন্দোলনকারীরের রাষ্ট্রের দুশমন, ভারতীয় চর, হিন্দু ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে 'মর্নিং নিউজ' 'সংবাদ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রচারণা চালাতে শুরু করে। একুশে ফেব্রুয়ারী গুলীতে যে চারজনেরও বেশী নিহত হয়েছিল এবং নিহতদের মধ্যে যে শিশুও ছিল সে কথা জানা যায় ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে ২৩শে ফেব্রুয়ারীর 'আজাদে' প্রকাশিত নিম্নোক্ত সংবাদটি থেকে ঃ

বৃহস্পতিবারের ঘটনা সম্পর্কে শহরের প্রবল গুজব যে ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয়। একটি কিশোর বয়স্ক বালক সম্বন্ধে অনুরূপ গুজব শুনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পরে জানা যায় যে, বালকটি মেডিক্যাল কলেজ ও পরিষদের মধ্যে ফুলার রোডে গুলীতে নিহত হয় এবং তাহার লাশ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়।

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদে গুলী বর্ষণের প্রতিক্রিয়া

সরকারী প্রেসনোটে গুলীবর্ষণ ও গুলীতে তিনজন নিহত এবং নয়জনের আহত হবার স্বীকৃতি থাকলেও পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের সভায় প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন তা স্বীকার করেননি। একুশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় পরিষদ ভবনে (বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন) ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এই নিবেদন করেন যে ঃ

যখন দেশের ছাত্ররা যারা আমাদের ভাবী আশা-ভরসাস্থল পুলিশের গুলীর আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে ইনকোয়ারি তারপর হাউস চলবে।

একুশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদে বলেন ঃ

......তারা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'......এতেই পুলিশ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে, অত্যন্ত বিস্ময়, লজ্জা ও দুঃখের বিষয় এই যে, তারা শান্তিপূর্ণ ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়, তারা শুধু ছাত্রদের আক্রমণ বা আঘাতই করেনি কয়েকজন ছাত্র নিহতও হয়েছেন। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই দুইশতের অধিক ছাত্রকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে পরিষদের কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।......

মনোরঞ্জন ধর পরিষদে হাসপাতালের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

......হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম প্রায় ২০০ ছাত্র বিভিন্ন প্রকার ক্ষত নিয়ে পড়ে আছে। একটি ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম, একজনের মাথার খুলি সম্পূর্ণ উড়ে গেছে এবং মগজ বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। আরো অনেককে দেখলাম তাদের মাথা, পা এবং পেটে ক্ষতচিহ্নসহ। আমরা ছাত্রদের প্রতি পুলিশের বেপরোয়া গুলী চালনার শব্দ শুনেছি, আমরা দুইজনকে মৃত এবং তিনজনকে মৃত্যুপথযাত্রী দেখে এসেছি। তারা কি আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ছাত্রদের লাশের ওপর দিয়ে তাদের শাসন কায়েম রাখতে চান? আমি অবিলম্বে পরিষদের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালে গিয়ে ঐসব অভিযোগ ও ঘটনার সত্যতা যাচাই করে আসতে অনুরোধ জানাই। যে সব অফিসারের আদেশে ছাত্রদের কুকুর-বিড়ালের মতো হত্যা করা হয়েছে আমি তাদের আচরণ সম্পর্কে তদন্তের এবং তাদের বরখাস্তেরও দাবী জানাই।

পরিষদের অধিবেশন যখন শুরু হয় তখন পরিষদের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন পরিষদে উপস্থিত ছিলেন না, অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরে তিনি পরিষদ কক্ষে উপস্থিত হন। একুশের ঘটনা সম্পর্কে পরিষদে তিনি যে বিবৃতি দেন সংক্ষেপে তা ঃ

সকাল দশটা থেকে ছাত্ররা অন্যান্য তরুণদের সহায়তায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে পুলিশ কর্ডন ভেদ করে শহরে শোভাযাত্রা বের করার চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের প্রাঙ্গণ ঘেরাও করে রেখেছিল যাতে তারা রাস্তায় বেরিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করতে না পারে। পুলিশ প্রাঙ্গণে ঢোকেনি, আমি যতদূর খবর পেয়েছি পথচারীদের ওপরে ইট,পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়, তাদের গাড়ী ভাঙা হয়, ছাত্ররা যখন প্রাঙ্গণ ছেড়ে গাড়ী চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করছিল পুলিশকে তখন বাধা দিতে হয়। উচ্চপদস্থ অফিসার সহ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আহত হয়েছেন। কয়েকজন

পুলিশও আহত হয়, তবুও হস্তক্ষেপ করা হয়নি, প্রথমে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়।

গুলী চালনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে নুরুল আমীন বলেন, তিনি তখনও জানেন না যে, গুলী চালানো হয়েছে কিনা। তবে লাঠি চালানো হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ পার্টিকে ঘেরাও করলে এবং তাদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হলে তারা 'আত্মরক্ষার জন্যে' ব্যবস্থা অবলম্বন করে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস তাদের সঙ্গে হাসপাতালে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে গিয়ে স্বচক্ষে অবস্থা দেখে আসার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে আহবান জানান। বলা বাহুল্য যে, নুরুল আমীন তা করতে রাজী হয়নি।

পনের মিনিট বিরতির পরে পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে নুরুল আমীন বলেন ঃ

> ......যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে, এ ব্যাপারে আমি আমার আবেগ প্রকাশ করতে পারি না, তারা তরুণ আশাবাদী এবং যদি গুলী চালানোর কোন যুক্তি না থেকে থাকে তাহলে তারা আমার সরকারের সমর্থন পাবে না। এ কথা জেনে আমি মর্মাহত যে, কয়েকজন ছেলে গুরুতররূপে আহত হয়েছে কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ থেকে আমি এখনো কোন রিপোর্ট পাইনি।

নুরুল আমীন শেষ পর্যন্ত গুলী চালানোর কথা স্বীকার করলেও তার ফলে যে কয়েকজন নিহত হন, তা পরিষদে স্বীকার করেননি। প্রতিবাদ স্বরূপ মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদে নিম্নোক্ত আবেদন রেখে পরিষদ ত্যাগ করে চলে যান ঃ

> যখন আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নীচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাশত করতে পারি না। আমি জালিমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে......সকল মেম্বরের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আহবান জানাচ্ছি।

৫

পরিষদে বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস ও সদস্য শামসুদ্দীন আহমদের পরিষদ বিরতির অনুরোধ উপেক্ষিত হলে বিরোধী দলের

সদস্যরা পরিষদ ত্যাগ করে চলে যান। অপর দিকে একুশে ফেব্রুয়ারী বিকাল পাঁচটা থেকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এবং বাইশে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে সলিমউল্লাহ হল ও আন্যান্য ছাত্রাবাসে 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করা হয়। একুশে বিকেলে মেডিক্যাল হোস্টেল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাইক্রোফোনে কণ্ঠ শোনা যায় ছাত্র নেতাদের এবং দীর্ঘদীন আত্ম-গোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী শহীদুল্লাহ কায়সারের। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ছাত্র কন্ট্রোলরুম ও কর্মী শিবিরের নির্দেশে আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। গুলী চালনা ও ছাত্র হত্যার খবর আগুনের মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত দেশ ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, যার অভিব্যক্তি ঘটে একুশের ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামে রচিত মাহবুবউল আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' নামক দীর্ঘ কবিতায়,।

চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা 'সীমান্ত' সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরীর উপরোল্লিখিত কবিতাটি অবিলম্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত, প্রচারিত এবং যথারীতি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' একুশের ওপর প্রথম কবিতা।

২১ ফেব্রুয়ারী গুলীর পর থেকে ছাত্রদের ভাষা আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়, ঐ সংবাদে দেশের সমস্ত দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, অফিস-আদালত, রেলওয়ে এমনকি বেতার পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বেতারের ধর্মঘট সম্পর্কে 'স্পষ্টভাষী' ১৯৭৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার 'মঞ্চে নেপথ্যে' স্তম্ভে লিখেছেন ঃ

> আমার মনে পড়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর গুলীর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেতার শিল্পী ও লেখকগণ নাজিমুদ্দীন রোডে 'আবন মিয়ার রেস্টু-রেণ্টে' সমবেত হইয়া উক্ত গুলীর প্রতিবাদে রেডিওতে আর্টিস্ট স্ট্রাইক ঘোষণা করেন। মরহুম কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দর আবু-জাফর, সায়ীদ সিদ্দিকী এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জনাব আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ প্রমুখ গুণী ছিলেন উহার নেতা। আর উহাই ছিল একুশের গুলী চালাবার বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রথম স্ট্রাইক।...

বাইশে ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং শহরের নিয়ন্ত্রণ সামরিক বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাইশ তারিখ সকাল-দশটার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এক বিরাট গায়ে-

বানা জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। নামাজের ইমাম মোনাজাতে বলেনঃ

> হে আল্লাহ আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়, আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায়, তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।

সেদিন ঐ মোনাজাত ছিল দেশের সব মানুষের। কোটি কোটি মানুষের ফরিয়াদ যে বৃথা যায়নি, পরবর্তী সময়ে জালেমের পরিণতি তার প্রমাণ। ২২শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে এক বিরাট জনসভা হয়, সভায় অলি আহাদ সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঘোষণা করেন। সভা শেষে লক্ষাধিক মানুষের এক শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রায় কালো পতাকা ছাড়াও ছিল শহীদের রক্তরাঙা কাপড়-চোপড় থেকে তৈরী অনেকগুলো পতাকা। এই শোভাযাত্রার ওপরে হাইকোর্টের সামনে লাঠি চার্জ ও গুলী চলে, ফলে অনেকে হতাহত হন।

?? হাইকোর্টের সামনের পথেই বাইশে ফেব্রুয়ারী তারিখ শহীদ হয়েছিলেন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান। ২২শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত দিন ধরে শহরে বিক্ষোভ চলে, অসংখ্য শোক-শোভাযাত্রা বের হয়। বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদমুখর জনতা ও শোক-শোভাযাত্রার ওপরে সারাদিন ধরে বার-বার লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ ও গুলী চলে। বিক্ষুব্ধ জনতা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার প্রেস জ্বালিয়ে দেয়, ঐ পত্রিকায় একুশের ঘটনাবলীকে বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক ও বৈদেশিক প্রভাবপুষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। নূরুল আমীন পরিচালিত পত্রিকা 'সংবাদ' অফিসের দিকে যাবার চেষ্টা করলে 'নিশাত' সিনেমা হলের কাছে জনতার ওপর গুলী চালানো হয়, এখানে যারা হতাহত হন তাদের মধ্যে ছিলেন আউয়াল নামে একজন রিকশাচালক। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'আজাদ' পত্রিকায় ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবারের ঘটনাবলী সম্পর্কে 'শুক্রবার শহরের অবস্থার আরও অবনতিঃ সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে 'পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলীতে ৪ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত, সাত ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারিঃ শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন। পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পরিষদ সদস্যপদে এস্তেফা' উপ-শিরোনামায় নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়ঃ

বৃহস্পতিবারের শোচনীয় ও ভয়াবহ ঘটনা বিস্মৃত হইতে না হইতে গতকল্য (শুক্রবার) জুম্মার দিন আর একবার ঢাকার মাটি শিশু ও ছাত্রের রক্তে লাল হইয়া ওঠে—সেদিনকার ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থ শান্তিপূর্ণ মিছিল বাহির করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের গুলীর আঘাতে নাগরিকদের ৪ জনকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় এবং শতাধিক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে নীত হয়। ইহাদের মধ্যে ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহাদের ১৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। এইদিন সমস্ত শহরে সমস্ত দোকান-পাট, বাজার-ঘাট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। অফিস-আদালত এমন কি সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীগণও স্বঃস্ফূর্তভাবে কর্মে যোগদান হইতে বিরত থাকিয়া বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। শহীদ ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য শহরের আবাল-বৃদ্ধ সকলে অবিরামভাবে বিভিন্ন মসজিদে জমায়েত হন এবং গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করেন। এইদিন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জনাব এ কে ফজলুল হকের উপস্থিতিতে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনার পর...ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভা-যাত্রা হোস্টেল প্রাঙ্গণ হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত পেঁৗছিলে পুলিশ ও সৈন্যরা তাহাদের উপর লাঠি চার্জ ও গুলী বর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলে কয়েকজন হতাহত হয়। শোভাযাত্রাটির সম্মুখভাগে নিহত ও হতাহতদের রক্তমাখা জামা-কাপড় ইত্যাদি দেখানো হইতেছিল।......গতকল্যকার ঘটনার বিশেষত্ব হইল এই যে, সৈন্য-গণকে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীনের খোঁচায় বিক্ষোভকারীগণকে ঘায়েল করিতেও দেখা যায়। বেলা প্রায় এগারটার সময় রথখোলা ও 'নিশাত' সিনেমা হলের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষমাণ নিরীহ পথচারীদের ওপরে বেপরোয়া-ভাবে গুলী চালান হয়......ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে 'বেয়নেট' দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয়......সকালের দিকে নওয়াব-পুর রোডের বিভিন্ন স্থানে সামরিক লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে গুলী চালায়......।

২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকায় সান্ধ্যআইন জারী করা হয়। ঐদিন 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যপদে এস্তেফা দানের জন্য গভর্নর ও পরিষদের স্পীকারের নিকট নিম্নবর্ণিত পদত্যাগপত্রটি পেশ করেন ঃ

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থক—এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।

ঐ পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

২২শে ফেব্রুয়ারী বিকেল পৌনে পাঁচটায় পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক-পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং আলি আহমদ খান একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী আলোচনার জন্য একটি মুলতবী প্রস্তাব ও খয়রাত হোসেন একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ঐসব প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, মুলতবী প্রস্তাবের পক্ষে উপস্থিত ৭২ জন সদস্যের মধ্যে ৩৫ জন দণ্ডায়মান না হওয়ায় তা উত্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারীর 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় 'হিন্দু এম-এল-এস এ্যাড্রেস স্টুডেন্টস' শিরোনামে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রধান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছ থেকে ঐ পত্রিকা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে জানতে চান। নূরুল আমীন কোন উত্তরদানে বিরত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ঐদিন পরিষদে একটি 'স্পেশাল মোশান' আনয়ন করেন, তাতে বলা হয়ঃ

> এই পরিষদ গণপরিষদের কাছে এই সোপারেশ করছে যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক।

খয়রাত হোসেন ঐ প্রস্তাবটির একটি সংশোধনী আনয়ন করে প্রস্তাবের শেষাংশে এই কথাগুলো জুড়ে দিতে বলেনঃ

> এবং পরিষদকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, ৩ দিনের মধ্যেই একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উত্তরাধিকারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

স্পীকার সংশোধনীটি যথারীতি নয় বলে অগ্রাহ্য করেন। আলি আহমদ খান পরিষদে বলেনঃ

> গতকাল এই ঢাকা শহরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এ দেশবাসী সকলেই মর্মাহত হয়েছে। আজকে সরকার পক্ষ একটা স্পেশাল মোশান এনেছেন প্রকৃত কথা ধামাচাপা দিয়ে লোককে বুঝাবার জন্য যে,

ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করেছিলেন।

৬

খয়রাত হোসেন পাকিস্তান গণপরিষদের পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে বাংলা ভাষার প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে অপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পীকার প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। মনোরঞ্জন ধর প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়ন করেন ঃ

> এবং পাকিস্তান গণপরিষদের যে সব সদস্য মুসলমান বা সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রতি এই স্পষ্ট ম্যাণ্ডেট দেওয়া হোক যে, ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী তারা যেন বাংলা ভাষার দাবীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গণপরিষদের সাধারণ অধিবেশনে এবং সংবিধান রচনা সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক কমিটিতে সর্বাত্মক সমর্থন সংগ্রহ করেন।

মিসেস আনোয়ারা খাতুনও ভাষার প্রশ্নটি পাকিস্তান গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করার দাবী জানান। প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল মোশানকে আন্দোলন চাপা দেওয়ার কৌশল বলে উল্লেখ করেন। মিসেস আনোয়ারা খাতুন মেয়েদের ওপর পুলিশী জুলুম সম্পর্কে পরিষদে বলেন ঃ

> ঘটনা দেখে মনে হয় আজও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাই নাই, তার প্রমাণ এই পুলিশ জুলুম। এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই—ছেলেদের কথা আর নাই বললাম—যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানে না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়—দু'একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব—মিলিটারী মেয়েদের গাড়ীতে করে কুর্মিটোলা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। যে মিনিষ্ট্রি আমলে এই সমস্ত অত্যাচার হয়, যারা মাতৃজাতির সম্মান দেয় না, তাঁদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা উণ্ডেড হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনার নাম দিচ্ছি। একজন হল ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম আর একজন হল মিস রওশন আরা থার্ড ইয়ার বি, এ। মেয়েদের টোটাল উণ্ডেড-এর সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।

মিসেস আনোয়ারা খাতুন সমস্ত গ্রেফতারকৃত বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি, আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ, হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ীদের বিচার, সরকারের দমননীতি বন্ধের দাবী জানান। আলী আহমদ চৌধুরী খাজা নাজিমউদ্দীনের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ভাষণ প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি পরিষদে বলেন ঃ

> কেন নৃশংসভাবে গুলী চালিয়ে ছাত্রদের মারা হল? কেন হোস্টেলের ভিতর, হাসপাতালের ভিতর ঢুকে পুলিশ ও মিলিটারী গুলী চালাল—গুলীর আঘাতে একটি ছাত্রের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছে, এ যেন গভর্নমেণ্টের কোন শত্রুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চিরকালের জন্য ইতিহাসে নূরুল আমীন সাহেবের কলংক হয়ে থাকবে।

বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী যেসব বীর ছাত্র এই আন্দোলনে তাদের জীবনপাত করেছে তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সহানুভূতি এবং সমবেদনা জ্ঞাপক একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন ঃ

> আজ শহরে যারা ঘুরেছেন, তারা দেখেছেন যে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশান বলে কিছু নেই। ভারচুয়েলি মার্শাল ল' জারী হয়েছে। কেবল মিলিটারী, স্টেনগান আর ব্রেনগান, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কম্পাউণ্ড যদি দেখে থাকেন তিনি জানেন কি পরিমাণে মিলিটারী কনসেনট্রেশন সেখানে হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন মিলিটারী এডমিনিস্ট্রেশন চলছে।

শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম ও তরুণের রক্তে রঞ্জিত করার জন্য দায়ী যারা সেই নূরুল আমীন সরকারের আশু পদত্যাগ দাবী করেন। পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যদের সমালোচনার উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন ঃ

> সান্ধ্য আইন জারী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ আমি নাগরিকদের দুষ্কৃতকারীদের শিকার হতে দিতে পারি না।...... যখন অবস্থার অবনতি ঘটেছে তখন আমাকে সেনাবাহিনী ডাকতে হয়েছে।

শামসুদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'মিসক্রিয়েন্ট' বা 'দুষ্কৃতকারী' শব্দটি প্রত্যাহারের দাবী জানান। নূরুল আমীন ঐ দাবী অগ্রাহ্য করে আরো বলেন ঃ

> মিসেস আনোয়ারা খাতুন তার বক্তৃতার মাঝে অনেকগুলো দাবী উত্থাপন করেছেন, আমি দেখলাম যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টি

কর্মপরিষদ কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে একই দাবী উত্থাপন করা হয়েছে।

পরিষদে সমস্ত মুলতবী ও সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কিত নুরুল আমীনের বিশেষ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী গভর্নর আকস্মিকভাবে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

৭

তেইশে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিনও ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়, ঢাকা রেলওয়ে কর্মচারীরা ঐদিন হরতাল পালন করেন। ফুল-বাড়িয়া পশু হাসপাতালের নিকট পুলিশ জনতার ওপর লাঠিচার্জ করে, ফলে কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হয়। ঐদিন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পক পরিষদের সদস্য মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ মুসলিম লীগ পরিষদ দল থেকে পদত্যাগ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারীর 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে নুরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে লেখা হয়ঃ

> গত দুইদিন ধরিয়া ঢাকা শহরের বুকে যে সব কান্ড ঘটিতেছে সে সবকে শুধু শোকাবহই নয়, বর্বরোচিতও বলা চলে। জনাব নুরুল আমীন পুলিশ জুলুম সম্মন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছেন এবং ১৪৪ ধারা জারীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্তত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোন ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারা বলবৎ রহিয়াছে, ফলে গুলীতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে পথ রঞ্জিত হইতেছে। নুরুল আমীন মন্ত্রী-সভার ব্যর্থতা সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছি।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যেসব বীর ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর গুলীর আঘাতে বুকের রক্তে ঢাকার মাটি রঞ্জিত করে দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতিকে অমর ক'রে রাখার উদ্দেশে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদের রক্ত যেখানে ঝরেছিল সেই স্থানে ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক রাত্রির মধ্যে ছাত্ররা একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহীদ মিনার নির্মাণ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই মিনারটি খুনী সরকারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়

২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী শহীদ মিনারটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়, অবশিষ্ট থাকে বার নম্বর ব্লকের বেড়ায় লাগানো একটি পোস্টার 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা' ?

আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত ছিল, চব্বিশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং শিক্ষকেরা পৃথক পৃথক সভায় গুলী-বর্ষণের প্রতিবাদ এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিক্ষকদের সভায় বক্তৃতা করেছিলেন অধ্যাপক মুজফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক সারওয়ার মুরশিদ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পঞ্চম দিবসে ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন পুলিশ জননিরাপত্তা আইনে রাজনৈতিক নেতা মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, আবুল হাশিম, মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল ব্যানার্জিকে গ্রেফতার করে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য স্থানের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় এবং ৫ই মার্চ শহীদ দিবস পালনের ডাক দেয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারেও সরকারী দমন-নীতির স্টীম রোলার অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটির বিলোপ সাধন ছাড়াও ঐ দিন দুপুর আড়াইটার সময় পুলিশ ও মিলিটারী সলিমউল্লা হলে হামলা করে। ঘরে ঘরে হানা দিয়ে ত্রিশজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়, এই অভিযান দুই ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়েছিল। ঐদিন ভোরে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজফফর আহমদ চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, পি, সি চক্রবর্তী এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহ এবং বরিশালের রাজনৈতিক নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনকে গ্রেফতার করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনের নয়জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয়, খালেক নাওয়াজ খান, শামসুল হক, মোঃ তোয়াহা, অলি আহাদ, এস, এম, নুরুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব, এম, এ, আউয়াল, আজিজ আহমদ ও আবদুল মতিন। ৯ই মার্চ রাতে এক গোপন সভা থেকে ঐ নেতাদের মধ্য থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, জনৈক কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সংগ্রাম পরিষদের ঐ সদস্যরা ধরা পড়েন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণের সময়

চাষারাতে জনতা পুলিশকে বাধাদান করে, মমতাজ বেগম ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন বিশেষ্ট কর্মী। জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে এখানে ৪৫ জন আহত এবং ওসমান আলি এম, এল, এ সহ বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ,১লা মার্চ সরকারী সূত্রে পরিবেশিত নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত বলে কথিত একটি ঘটনা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সংক্ষিপ্ত সরকারী সংবাদটি ছিল, 'গুলীর আঘাতে নারায়ণগঞ্জে প্রহরারত একজন কনস্টেবল্ ঘটনাস্থলে নিহত ও একজন আনসার আহত হইয়াছে।' নারায়ণগঞ্জের কোন জায়গায়, কোন সময় কিভাবে কার গুলীতে কনস্টেবলটি নিহত হয় সরকারী সংবাদে তার কোন উল্লেখ ছিল না। অবশ্য ঐ সংবাদটির সঙ্গে সংশিলস্ট প্রধানমন্ত্রীর যে বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে খবরটির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়, নুরুল আমীন বলেন ঃ

> মৃত্যুবরণ করিয়া কনস্টেবলটি কর্তব্যপরায়ণতার মহান দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল, আমার বিশ্বাস তৎদৃষ্টে জনগণের বিশৃংখলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ভাষার প্রশ্নের আবরণের নীচে যে একটি রাষ্ট্রধ্বংসী কুপ্রয়াস চলিতেছে তাহা ক্রমশঃ বাহির হইয়া আসিতেছে।

২রা মার্চে প্রকাশিত অপর একটি সরকারী সংবাদ থেকে জানা যায় যে পূর্ববঙ্গ সরকার নারায়ণগঞ্জ কালীরবাজারে আততায়ীর গুলীতে নিহত কনস্টেবল সৈয়দ জোবেদুল হকের পোষ্যদের জন্য এককালীন ১০ হাজার টাকা ভাতা দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। কনস্টেবলের সঙ্গে প্রহরারত আহত আনসার খলিল আহমদকে সরকার দুই হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত করেন। ৩রা মার্চ প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন এক বেতার ভাষণ দেন, এই ভাষণটি ছিল মিথ্যার বেসাতি, তাতে তিনি বলেন ঃ

> এই গোলাযোগের সময় নারায়ণগঞ্জে যুক্তবঙ্গের অনুকূলে বিভিন্ন ধ্বনি দেওয়া হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল...সরকারকে ধ্বংস করিয়া সেখানে নিজেদের মনোনীত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের দ্বারা পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার মূল লক্ষ্য হাসিল করা।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর ফলে ভাষা আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপায়িত হলে দিশেহারা নুরুল আমীন, তার সরকার ও দল বাংলা ভাষা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতা, যুক্তবঙ্গের ধুয়া এবং কমিউনিস্ট জুজু তুলে বানচাল করার যে প্রয়াস চালাচ্ছিলো নারায়ণগঞ্জের ঘটনা তারই অংশ ছিল।

সরকার একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার তদন্তের জন্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, কিন্তু আন্দোলনের নেতাদের বন্দী রেখে, সরকারী লোক দিয়ে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ ঐ কমিশন বর্জন করেছিল। তদন্ত কমিশন রায় দিয়েছিল যে :

(ক) ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ কতৃক গুলীবর্ষণের প্রয়োজন ছিল।

(খ) সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুলিশের বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিল।

একুশের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফলে ছাত্রদের বাংলা ভাষার দাবী জনসাধারণের দাবী হয়ে গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক একুশ দফার, সেই একুশের প্রতীক একুশ দফাকে নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে যে একুশ দফা--তার থেকেই সৃষ্টি নূরুল আমীনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমীর। একুশের চেতনা থেকেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, যার পরিণতি স্বাধিকার এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম তথা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের। যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব।

সরকার ও ভাষা

অবিভক্ত ভারতের মুসলমানেরা এক ভাষাভাষী ছিলেন না, বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানের মাতৃভাষা ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। তবে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা অবিভক্ত ভারতের অন্য ভাষাভাষী মুসলমানদের চেয়ে যে বেশী ছিল তার প্রমাণ ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানটি।

বাংলা	২৩,৯৯৫,০০০
উর্দু ও পশ্চিমা হিন্দী	২০,৭৯১,০০০
পাঞ্জাবী	৭,৭০০,০০০
সিন্ধী	২,৯১২,০০০
কাশ্মীরী	১,৫০০,০০০
পুশতু	১,৪৬০,০০০
গুজরাটী	১,৪০০,০০০
তামিল	১,২৫০,০০০
মালয়ালাম	১,১০৭,০০০
তেলেগু	৭৫০,০০০
উড়িয়া	৪০০,০০০
বালুচী	২২৪,০০০
ব্রাহুই	১২২,০০০
আরবী	৪২,০০০
ফারসী	২২,০০০
অন্যান্য	৫,০৬০,০০০

কিন্তু ঐ ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তববোধ পাকিস্তান সরকারের ভাষানীতিতে ছিল অনুপস্থিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের সময় ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পুশতু, বালুচী, ব্রাহুই এবং পূর্ব পাকিস্তান বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে উর্দুভাষী মুসলমানেরা ব্যাপক সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে (বিশেষতঃ করাচীতে) এবং স্বল্প সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করলে পাকিস্তানে শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ উর্দুভাষী নাগরিক সংযুক্ত হয়, এই

মোহাজেরদের মধ্যে আবার সকলেই উর্দুভাষী ছিলেন না, অনেকে ছিলেন হিন্দী বা অন্যান্য ভাষাভাষী। কাশ্মীর লড়াইয়ের পর কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানে সংযুক্ত হলে কাশ্মীরী ভাষাও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐসব পরিবর্তনের পরেও সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শুরুতে পাকিস্তানের মোট ছয় কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জন ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী। অর্থাৎ পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বালুচী, ব্রাহুই, উর্দু, কাশ্মীরী ভাষাভাষীদের মোট সংখ্যার চেয়ে বাংলা ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা ছিল অধিক। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান গণপরিষদের আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে (২৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ও ২রা মার্চ, ১৯৪৮ খৃঃ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির ঊনত্রিশ নং উপ-ধারা সংশোধন প্রয়াসে 'ইংরেজী' ভাষার সঙ্গে 'উর্দু' ভাষার নাম যুক্ত করার সরকারী প্রস্তাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্ত সংশোধনীটি উত্থাপন করেন ঃ

> That in sub-rule 29, after the word "English" in line 2, the words, "or Bengali" be inserted :

এই সংশোধনীর সমর্থনী ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে যুক্তিউত্থাপন করেন তার অংশ বিশেষ হল ঃ

> ...what should be the state language of the state ? The state language of the state should be language which is used by the majority of the people of the state, and......I consider that Bengali language is a lingua franca of our state...... if English can have an honoured place in rule 29—that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bengali, which is spoken by four crores fourty lakhs people should not have an honoured place,...... and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language, It should be treated as the language of the state And therefore......I suggested that after the word "English' the words "or Bengalee" be inserted in rule 29.

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রবল সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এ সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া

যায় প্রস্তাবটির বিরোধিতায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের ভাষণ থেকে ঃ

......Pakistan has been created because of the demand of a hundred million muslims in this sub-continent and the language of a hundred million muslims is Urdu and,......Pakistan is a muslim state and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation ......Urdu can be the only language which can keep the people of East Bengal or Eestern zone and the people of Western zone joined together. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের 'the language of a hundred million Muslims is Urdu' উক্তিটি কৌতুকপ্রদ। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের শুরুতেই আমরা ভারতের মুসলমানদের ভাষাভিত্তিক যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছি তার থেকে প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি ও তথ্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আশ্চর্যের কিছুই নেই যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী অগ্রাহ্য হবার ফলশ্রুতি পূর্ব বাংলায় 'বাংলা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, প্রথম পর্যায় ১৯৪৮'।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছিল বাংলাভাষার সরকারী মর্যাদা লাভের আংশিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' সঙ্গে পূর্ব বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির ৩ ও ৪ নং ধারা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্যে যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণ ভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে।

ঐ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাত্র চারদিন পরেই এবং উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার পূর্বেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পূর্ব বাংলায় আগমন করেন। তিনি ২১শে মার্চ, '৪৮ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছিলেন,

> But let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan.

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঐ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৯৪৮ সালে যারা বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়েছিলেন তারা সরকারের চোখে 'পাকিস্তানের দুশমন' ছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২৪শে মার্চ, '৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমবর্তন উৎসবে ভাষা সম্পর্কিত তাঁর মতামত পুনরাবৃত্ত করেন ঃ

> There can be only one state language. If the component parts of the state are to march forword in unison, and that language, in my opinion can be only be Urdu.

ভাষা সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ১৫ই মার্চ, '৪৮ এর চুক্তিটি কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের এবং চুক্তির ৩ ও ৪ নং ধারার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে ইংরেজী ও উর্দু ভাষার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া সেখানে ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব দুটিতে তার কোন উল্লেখই ছিল না, বরং বাংলাকে নির্ভেজাল প্রাদেশিক ভাষা রূপে ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব দুটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

a) Bengali shall be adopted as the official language for replacing English in the province of East Bengal; and it will be implemented as soon as the practical difficulties are removed ; and

b) the medium of instruction in educational institutions in East Bengal shall, as far as possible be Bengali, or the mother tongue of the majority scholars in the institutions.

বলা বাহুল্য যে ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত ঐ প্রস্তাব দু'টি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের চুক্তিভঙ্গের দলিল মাত্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতি, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দান নয় বরং বাংলা ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধনের অনুকূল ছিল। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ২৭শে ডিসেম্বর, '৪৮ নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে 'ইসলামী আদর্শের জন্যে' বাংলাভাষার পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী লিখনপ্রণালী পরিবর্তন করে আরবী (প্রকারান্তরে উর্দু) হরফে পরিবর্তনের' প্রস্তাব করেন এবং তদানুযায়ী ৭ই ফেব্রুয়ারী, '৪৯ 'কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড' পাকিস্তানের সব ভাষার জন্যে একমাত্র আরবী হরফ প্রবর্তনের জন্যে জোর সুপারিশ করে। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের সব ভাষাতেই আরবী হরফ প্রচলিত ছিল, কাজেই প্রস্তাবটির লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষার হরফ পরিবর্তন। ঐ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানে আরবী হরফে বয়স্কদের প্রাথমিক বাংলা শিক্ষাদানের জন্যে বিশটি কেন্দ্র চালু করেছিল এবং বেশ কিছুকাল ধরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাংলা ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন পূর্ব বাংলা সরকারের ভাষা নীতির মৌল আদর্শ ছিল। ৯ই মার্চ, '৪৯ পূর্ব বাংলা সরকারেরও ভাষা কমিটি'র ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০-এ পেশকৃত রিপোর্টের, সুপারিশসমূহে ঐ নীতি প্রতিফলিত হয়েছিল, সর্বোপরি কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল :

> The Urdu be studied as a second language in the secondary and higher stage of our (East Pakistan's) education, in order that we may make the linguistic, social, political and cultural bonds between the two wings of Pakistan closer and deeper.

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন ঘনিষ্ঠ এবং গভীরতর করার জন্যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে শিক্ষা দানের কথা বলা হলেও 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি বা উল্লেখ করেনি। মনে হয় পাকিস্তানের উভয় অংশের সম্পর্ক গভীরতর করার দায়িত্বটা এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় এবং চরম পর্যায়ে বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিস্তৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতিরই ফলশ্রুতি। ২৬শে জানুয়ারী, '৫২, ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিল সম্মেলনে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা **'Urdu will be the state language of Pakistan'** ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবসে ১৪৪ ধারা জারি, বাংলাভাষার দাবী পেশের জন্যে প্রাদেশিক আইন পরিষদের দিকে অগ্রসরমান ছাত্র-জনতার ওপর লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী চালনা এবং বাংলা ভাষার দাবীতে বাঙালীর প্রাণদান বাংলাভাষা আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত করে তোলে। মাতৃভাষার দাবীতে রক্তাক্ত 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র স্মৃতিকে ভাস্বর করার জন্যে 'একুশ দফা'র ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ক্ষমতাসীন দলের ভ্রান্ত ভাষা নীতিরই ফল। পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের ফলেই পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাভাষা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং ধারায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিধিসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(1) **The state languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali.**

Provided that twenty years from the Constitution Day, English shall continue to be used for all official purposes for which it was used in Pakistan immediately before the Constitution Day, and Parliament may by act, provide for the use of English after the said period of twenty years for such purposes as may be specified in that act.

(2) **On the expiration of ten years from the Constitution Day, the President shall appoint a Commission to make recommendations for the replacement of English.**

১৯৫৬ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ধারাসমূহ পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেখানে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাভাষার উল্লেখ থাকলেও বিশ বছরের আগে তা চালু হবার কোন সম্ভাবনা তো ছিলই না বরং তার পরেও ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা

রূপে চালু রাখার ব্যবস্থা তাতে বেশ পাকা ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল, আট বৎসরের সংগ্রাম এবং কয়েকটি অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে '৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষা পাকিস্তানের দূর ভবিষ্যতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে উল্লিখিত হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সে সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে গেল যখন ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল এবং জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানটি বাতিল ঘোষণা করলেন।

জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই পাকিস্তানের সমস্ত ভাষার জন্যে রোমান বা ইংরেজী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ইংরেজী হরফে হিন্দুস্তানী লেখার যে প্রথা প্রচলিত ছিল সে ঐতিহ্য জেনারেল আইয়ুবকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সেই প্রথম জমানাতেও উর্দু এবং বাংলার বিশেষজ্ঞরা জেনারেল আইয়ুবের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। জেনারেল আইয়ুব শিক্ষা সংস্কারের জন্যে যে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। সে কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে তাদের রিপোর্ট দাখিল করেন, কমিশন মত দিয়েছিলেন যে, পনের বছরের আগে বাংলা উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার বাহনও হতে পারে না ঃ

> It will take approximately fifteen years for Urdu and Bengali to reach the point of development where they can become effective medium of instruction at the University level.

শিক্ষা কমিশনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ও উর্দু ভাষাকে মিলিয়ে পাকিস্তানের জন্যে একটি 'সাধারণ ভাষা'র সৃষ্টি করা, তাই কমিশন সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে কাজে। কমিশনের মতে ঃ

> The supreme need should be recognized of bringing Urdu and Bengali nearer to each other by increasing the common element in their vocabularies and by putting such common elements to extensive use.

কমিটি উর্দু ও বাংলা ভাষা মিশ্রণের বা খিচুড়ীভাষা সৃষ্টির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় উর্দু ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ওপর অর্পণের প্রস্তাব করেছিল, তারই ফলশ্রুতি বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের 'উর্দু-বাংলা অভিধান'।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্যে যে সংবিধান ঘোষণা করেন, সে সংবিধানে বাংলা এবং উর্দু ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' নয়,

'জাতীয়' ভাষারূপে উল্লেখ করা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, সরকারী কাজ-কর্মে অন্যান্য ভাষা বিশেষত 'ইংরেজী' ভাষা ব্যবহারে কোন বাধা থাকবে না। ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে ভাষা সংক্রান্ত ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

1. The National languages of Pakistan are Bengali and Urdu, but this article shall not be contrued and, in particular, the English language may be used for official and other purposes until arrangements for its replacement are made.
2. In the year one thousand and nine hundred and seventy two, the president shall constitute a commission to examine and report on the question of the replacement of the English language for official purposes.

১৯৫৬ সালের সংবিধানের মতো ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানেও সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার ব্যবহার বা প্রচলন কুড়ি বৎসরের জন্যে অর্থাৎ ১৯৮২ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। স্বভাবতই সন্দেহ জাগে পাকিস্তানের সংবিধান রচয়িতারা রাষ্ট্র বা সরকারী ভাষা রূপে ইংরেজী ভাষা পরিবর্তনে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন কিনা। প্রতি-বারই জনমতের ভয়ে সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্র বা সরকারী বা জাতীয় ভাষারূপে বাংলা ভাষার উল্লেখ থাকলেও তার কার্যে পরিণতি সর্বদাই সুদূরপরাহত ছিল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে উন্নয়নের পরিবর্তে সংস্কারের নামে বিকৃত করার প্রয়াসই অধিকতর সক্রিয় ছিন। উদা-হরণস্বরূপ মোনায়েম খানের শাসনকালে বাংলা একাডেমীর সংস্কার প্রয়াস স্মরণীয়। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী বাংলা ব্যাকরণ, লিখনপ্রণালী এবং বানান সংস্কারের যে প্রস্তাব করেছিল তা কার্যকর হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হত তাকে বাংলা ভাষা ধ্বংসের নামান্তর বলা যেতে পারে। উল্লেখ-যোগ্য যে, বাংলা একাডেমীর বাংলা ভাষা সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসের সভায় কার্যত বাংলা একাডেমীর সুপারিশসমূহ চালু করার প্রস্তাব করে, আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কয়েকজন মাত্র সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের ঐ বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের পর পরই

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঢাকা হোটেল ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালে অনুষ্ঠিত নজরুল একাডেমীর এক অনুষ্ঠানে বাংলা ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে একটি 'কমন ল্যাঙ্গুয়েজ' বা 'সাধারণ ভাষা' সৃষ্টির প্রস্তাব করেন, কিন্তু উনসত্তরের আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনের ফলে ঐ 'খিচুড়ি' ভাষা উদ্ভাবনের পূর্বেই আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

পাকিস্তান সরকারের, ভাষানীতি বাস্তববোধবর্জিত ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে স্বীকৃতি বা মর্যাদাদানে তা সম্মত ছিল না। এই ভাষানীতি অবশ্য পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাংলা ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথমে স্বাধিকার এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়।

একুশের কবিতা, গান ও সংলাপ

একুশ নিয়ে আমাদের দেশে যত কবিতা লেখা হয়েছে আর কোন একক ঘটনা নিয়ে তত কবিতা রচিত হয়নি, ২১শে ফেব্রুয়ারী যত গভীরভাবে আমাদের কবিতাকে আলোড়িত করেছে আর কোন বিষয় তা করতে পারেনি। একুশের রক্তাক্ত স্মৃতি কবিতায় তাৎক্ষণিক এবং সুদূর প্রতিক্রিয়া ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে। একুশে ঘটেছিল ঢাকায় অথচ কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তার অনুরণন উঠেছিল চট্টগ্রামে। সেদিনই রচিত হয়েছিল মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি'। কবিতাটি দ্রুত রচিত হয়েছিল, প্রকাশিত ও প্রচারিতও হয়েছিল সমান গতিতে আর নিষিদ্ধ হবার গৌরবও লাভ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে। কবিতাটি আর দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়নি তবে কবির স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে তার কিছুটা ঃ

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে
যেখানে আগুনের ফুলকীর মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে রক্তের আল্পনা,
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহবল নই,
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই,
আমি আজ রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত।......
যে শিশু আর কোনদিন তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না,
যে গৃহবধূ আর কোনদিন তার স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না,
যে জননী খোকা এসেছে বলে উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর জড়িয়ে ধরতে পারবে না,
যে তরুণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বার বার একটি প্রিয়তমার ছবি চোখে আনতে চেষ্টা করেছিল,

তাদের সবার নামে আমি শাস্তি দাবী করতে এসেছি

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমি তাদের ফাঁসীর দাবী নিয়ে
এসেছি

যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে হত্যা করেছে,

যারা আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্ত
মাতৃ সম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে

আমার এই সব ভাইবোনদের হত্যা করেছে

আমি তাদের ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি।...

একুশের ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ক্রোধের, ক্ষোভের, ঘৃণার, প্রতিশোধের। ঘটনার আকস্মিকতা, অমানুষিকতা, সেদিন মানুষকে কি তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছিল একুশের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে রচিত মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতায় তা ধরা পড়েছিল বিশ্বস্তভাবে। উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পংক্তি নিচয়ে যে দাবী সোচ্চার তা ছিল সেদিনকার দেশবাসীর সকলের। যা কখনো পূরণ হয়নি। দেশে দেশে যুগে যুগে যে দাবী ওঠে যা কখনো পূরণ হয় না। যে দাবী পূরণের জন্য আরো অনেক রক্ত ঝরে। একুশেতে আমাদের রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল তাই আমরা তার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সম্বিত ফিরে পেতে আমাদের বিলম্ব হয়নি, তারপর আমরা দেখেছি একুশেতে ইতিহাসের এক অভিযাত্রার শুরু।

ঠিক তাৎক্ষণিক না হলেও একুশের প্রথম বছরের মধ্যেই যে কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছিল অর্থাৎ ঘটনার উত্তাপ নির্বাপিত হওয়ার পূর্বেই আরো যে সব আবেগ কবিতায় বিধৃত হয়েছিল হাসান হাফিজুর রহমানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে তা গ্রথিত হয়েছে। এ সংকলনটিও নিষিদ্ধ হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়নি, তবে সৌভাগ্যক্রমে তা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত।

একুশের ঘটনা একজন কবিকে তৎক্ষণাৎ কিভাবে আলোড়িত করেছিল একুশে নিয়ে যাঁরা কবিতা লিখেছেন সে কথা তাঁরা এখনও লেখেননি, তা আজও স্মৃতি। কিন্তু সে আবেগ যে কতো তীব্র, বিশ্বস্ত ও উত্তপ্ত ছিল তা অনুভব করতে পারি যখন শামসুর রাহমান-এর কবিতা পাঠ করি তখন ঃ

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোন হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর

রাত্রি রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।

এই সুন্দর পৃথিবীর নিসর্গের রূপ থেকে কবি নিজেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন, ঘটনার পাশবিকতায় ব্যাকুল, বিহ্বল, শোকাতুর কবি প্রকৃতির মোহ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃত পংক্তিসমূহে যে কামনা প্রকাশিত তা আবেগের কোন স্তর থেকে উৎসারিত তা আরো স্পষ্ট হয় কবি যখন আরো কঠিন আরো ভয়ংকর কিছুর জন্যে অনুনয় করেন ঃ

আগুনতাঁতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার দুটি চোখ
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন, বিদ্রোহী জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নিচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন-স্তব্ধতা,
দেখেছি বাস্তুহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো কুয়াশা-ঢাকা দিন,
দেখেছি মোহাম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়, তাদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।

এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা, এই অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল, বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল, বিবিধ বরন সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময় নিশি, বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র, সুনীলগগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা সুরদাসকে সতত ভোলায়, কোথায় নিয়ে যায়। তাই প্রার্থনা ঃ

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ম দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম;
লও, বিঁধে দাও বাসনাঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নেই, ফুটেছে মর্মতলে—
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটি চোখ;

সুরদাসের প্রার্থনা ছিল তার চক্ষু দুটির উৎপাটন কিন্তু শামসুর রাহমানের আবেদন ঃ

টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মতো হৃদপিণ্ড,...
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
তোমরা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃদপিণ্ড—
যে হৃদপিণ্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা,

কবির হৃদপিণ্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত 'আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা', কবির হৃদয়ের এ দেশ কোন্ দেশ ? সে দেশের পরিচয় কি ? সে দেশের সীমানা ?

কবির অবচেতনায় কি দেশ তথা স্বদেশের আবহমান চিরন্তর প্রতিকৃতি উদ্ভাসিত? তারপরে কবির চেতনায় ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে ঃ

দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতার,
দোহাই ফ্যারাওয়ের ম্যামিগন্ধি বীভৎসতার,
দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার,
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও ।।

উদ্ধৃত স্তবকে চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতার, ফ্যারাওয়ের ম্যামিগন্ধি বীভৎসতার, তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার উল্লেখ প্রতিপক্ষের স্মারক কিন্তু যে অস্তিত্ব ভাস্বর তাকে নিশ্চিহ্ন করার শক্তি কার ? কবিতার পরিসমাপ্তিতে 'উত্তরাকাশের তারার মতো ভাস্বর অস্তিত্ব'কে নিশ্চিহ্ন করার যে আহ্বান তা বস্তুত চেঙ্গিস, ফ্যারাও, তৈমুরের উত্তরসূরীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ, যে অস্তিত্বের বোধ কবিকে শোকের স্তব্ধতা থেকে বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত করে। একুশের শহীদের নাম প্রথম কবিতায় উচ্চারণ করেন হাসান হাফিজুর রহমান, যে কবিতায় সে নামগুলো উচ্চারিত সে কবিতার শুরুতে রয়েছে মাতৃ সম্বোধন। কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে 'আম্মা' শব্দটি দিয়ে, একটা গভীর বেদনার অভিব্যক্তি প্রশ্নের আকারে উত্থাপিত হয়েছে, 'আম্মা তাঁর নামটি একবারও ডাকবে না তবে আর ?' এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পংক্তিগুলিতে নিঃসৃত হয়ে আবার জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে ঃ

ঘূর্ণি ঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে ডাকবে,
দু'টি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না ?
কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতোদিন ?

তারপরে শহীদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তার দৈহিক গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকে মথিত করে, এ শহীদ অচেনা অজানা দূরের মানুষ ছিল না, পরিচিত চত্বরেই ছিল তার আনাগোনা, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় সে পরিচয়ের অন্তরঙ্গ ছাপ ঃ

আবুল বরকত নেই ; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর ষ্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাটতো যে
তাঁকে ডেকো না ;

ঐ কবিতায় শহীদের নামের পরিচর্যা করা হয়েছে বেদনা আর মমতা দিয়ে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা গৌরব একটা অহংকার ঃ

সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার—কি বিষণ্ণ থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ম ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে;

একটি বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মৃত্যু, যারা এর নায়ক তারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেল কিন্তু সে কয়টি নাম মুছে না গিয়ে কি করে চিরন্তন হয়ে গেল কি করে একটা জনগোষ্ঠীর বিস্মৃত স্বদেশকে নতুন করে সৃষ্টি করে দিয়ে গেল, কবির চেতনায় তা অনুভূত হয়েছে ঃ

যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্মৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।
আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ণ নাম! একসার জ্বলন্ত নাম।।

'থোকা থোকা এক সার বিষণ্ণ নামে'র 'একসার জ্বলন্ত নামে' রূপায়ণ এবং দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কণা কণা করে প্রাণের দীপ্তি ছড়িয়ে দেওয়া। হাসান হাফিজুর রহমানের এদেশ কি শামসুর রাহমানের দেশ থেকে আলাদা? সম্ভবত নয়। হাসানের কবিতায় দেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের কথা এসেছে, কবি বিশ্বাস রেখেছেন জনতার গভীরে ঃ

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলি
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু, সরু, অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে
বুনে এসেছি।

একুশের তৎপর্য দেশ ও দেশের মানুষের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস অর্পণ, দেশকে আপন জানা থেকে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয়, সেদিন মানুষ একটি দেশের কথা জানতে পেরেছিল যা তার নিজের দেশ। স্বদেশের অনুভূতিতে সেদিন যারা গভীরভাবে স্নাত হয়েছিল তাদের আবেগ এ কবিতায় ধরা পড়েছে ঃ

দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে
দেখিয়েছে—বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিল;

সমকালীন মানুষের চেতনায় স্বদেশ সেদিন সহসা সচকিত হয়ে উঠেছিল, দেশ ছিল, ছিল মানুষ। ছিল না স্বদেশ আর তার সন্তান। একুশে দেশকে স্বদেশ করেছে, দেশের মানুষকে দেশের সন্তান করেছে, দেশ

হয়ে উঠেছে দেশমাতৃকা। একটি দিন কি আশ্চর্যজনকভাবে সব বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে একটি জাতিকে তার মাতৃভূমি দিয়ে গেল ঃ

দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম…
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি,
কি আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছ—একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারিনি,
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছে—
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারিনি, দেশ আমার।।

'দেশ আমার' বাক্যটির পূর্বশর্ত দেশকে একান্ত আপনার অনুভূত হওয়া, এ ক্ষেত্রে তা ঘটেছিল। রাষ্ট্র আর দেশ যে একার্থ বা অভিন্ন ছিল না সে বোধেরও সৃষ্টি একুশে থেকে, আবার যে বোধ থেকে স্বদেশ চেতনার সৃষ্টি। এ বোধ ও চেতনার তথা স্বদেশের শত্রুর মোকাবেলার জন্যে কবিকে স্বাভাবিক ভাবেই মন্ত্রের সাধনা করতে হয়েছে ঃ

হে আমার জ্ঞান একটি মাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও
যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়,
ওষধি জন্মের মতো একবার স্পন্দিত হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না, হে আমার জ্ঞান!

এ জ্ঞান মাতৃভাষার মন্ত্র, একুশের সঙ্গে মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির চেতনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে মাতৃভাষায় ঃ

আয়ুর প্রথম হৃদয়মন্থিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে

সেই মাতৃভাষার সম্মানের জন্যে যারা মুখবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, জীবনের শত্রু, শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কিন্তু তাদের অমর আত্মা ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তা আজ স্বদেশ আর স্বদেশবাসীর হৃদয়ে সম্প্রসারিত ঃ

আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো
এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।।
হে আমার দেশ, বন্যার মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর
করেছি;

একটি চেতনাকে সমস্ত অভিজ্ঞতা সেদিন উর্বর করেছিল, সেই চেতনা মানুষকে একাত্ম করেছিল, স্বদেশের শত্রুর সঙ্গে দ্বৈরথে সেদিন সবাই এক হয়ে গিয়েছিল ঃ

এখানে রয়েছে মা আর পিতা,
ভাই আর বোন, স্বজন বিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার !
এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখী,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষ থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি ঃ
এবার আমরা তোমায়।।

স্বদেশের শত্রু মোকাবেলায় সেদিন মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচেছিল, দূর হয়েছিল মাতা আর মাতৃভূমির ব্যবধান। মা তথা মাতৃভূমির জন্যে মানুষ নিবেদন করেছিল নিজেকে। মানুষ সেদিন শহীদ ভাইর মৃত্যুশোক বিস্মৃত হতে পেরেছিল। মা তথা মাতৃভূমিকে খুঁজে পেয়ে মায়ের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাটির সমাপ্তি। সে আকাঙ্ক্ষা কবির মতো সবারই জানা। বায়ান্নর একুশের পর একুশের প্রথম শহীদদের রক্ত যেখানে ঝরেছিল সেখানে মানুষ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল, মাত্র একটি রাতের মধ্যে অসংখ্য হাত শহীদের স্মৃতিতে ঐ প্রতীকটি স্থাপন করেছিল. পরদিন সেটি হয়ে উঠেছিল তীর্থক্ষেত্র কিন্তু প্রতিক্রিয়ার হস্ত ঐ প্রতীকটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে বিলম্ব করেনি। কিন্তু ঐ একটি মাত্র দিনের ঘটনা, প্রথম শহীদ মিনারে পুষ্পের স্তবক অর্পণ, সেদিন মানুষের জন্য ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সেই স্মৃতির মিনার যখন চূর্ণ বিচুর্ণ ও ধূলিকণাসহ অপসৃত হল তারও একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সমকালীন কবির কবিতায় ধরা পড়েছিল। আলাউদ্দিন আল আজাদের ভাষায় ঃ

স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো।...
ইটের মিনার
ভেঙ্গেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী চারকোটি পরিবার।।

শুধু শহীদ মিনার নয়, যাদের স্মৃতিতে সেই মিনার, তাদের মৃত্যুকে মহিমাময় করেছেন আজাদ। যে মৃত্যুতে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠে, রচিত হয় কবিতা, বাধা হয় গান, সে মৃত্যু অমরতার অপর নাম, তার প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন,

এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার?

এই জনপদের ইতিহাসে মানুষ এর আগে কোন মৃত্যুতে এত মহিমা আরোপ করেনি, কয়েকটি সাধারণ মানুষ মৃত্যুর কারণে এত অসাধারণত্ব লাভ করেনি, তারা শুধু শহীদ বলে পরিগণিত হয়নি, তারা কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হয়েছে। আমাদের যে পুরাণ ছিল না একুশে সে পুরাণের অভাব পূরণ করেছে। সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় একুশের সে মহিমা কীর্তিত ঃ

দেশের মানুষ একটি দণ্ডে
একাত্ম হয়েছিল,
স্নায়ু-গ্রন্থিতে পাঁজরে-পেশীতে,
মেখে দিয়েছিল একটি অঙ্গীকার—
সেদিন প্রথম।
এবং প্রথম নতুন দিগ্বলয়ে
সঞ্চারমান এ দেশের ইতিবৃত্ত।

একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু কিংবদন্তি, কেবল ঐতিহ্য বা নিছক পুরাণ নয় একুশে আধুনিক পুরাণ। তাই একুশে এদেশের ইতিবৃত্তকে নতুন দিগ্বলয়ে সঞ্চারমান করেছিল। তার পরে আরো অনেক বড় ঘটনা ঘটেছে, আরো অনেক বড় সংগ্রাম, গভীর ত্যাগ, ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেছে, আরো অনেক অনেক রক্ত ঝরেছে কিন্তু একুশের মহিমাকে কোন ঘটনা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি, অতিক্রম করতে পারেনি। আর কোন দিন, কোন ঘটনা এ দেশ আর দেশবাসীর হৃদয়ে এত গভীর দাগ কাটতে পারেনি, কারণ সেদিন আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঃ

চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রা
নানান মুখীন হাজার লোকের
একত্র অস্তিত্ব
একুশে ফেব্রুয়ারী

রক্তঝরা একুশের রং লাল, একুশের স্মৃতি রক্তাক্ত, কিন্তু একুশের পতাকার রং কালো, শোকের চিহ্ন। একুশেতেই এদেশে প্রথম কালো পতাকা ওড়ে, যে পতাকা প্রায় বিশটি বছর এ দেশের জাতীয় পতাকার মতো উড়েছে যতদিন না লাল সূর্যখচিত পতাকার উদয় হয়েছে ততদিন। একুশের রঙীন ও সশব্দ চিত্রকল্প সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় ঃ

কালো পতাকায়
প্রাচীর-পত্রে
অশ্রু-তরল রক্তরঙের লিপি
ক্রোধের
ঘৃণার
ভয়াল বিস্ফোরণ
একুশে ফেব্রুয়ারী।

একুশের কবিতা রচিত হয়েছিল তাৎক্ষণিক আবেগে কিন্তু প্রয়োজন ছিল গানেরও, তাই একটি কবিতা গান হয়ে উঠেছিল। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কবিতা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এটি কবিতা হিসাবেই রচনা করেছিলেন যা আবৃত্তি করা হয়েছিল গেণ্ডারিয়া ধুপখোলার মাঠে যুবলীগের এক উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে। যুবলীগের তদানীন্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৈয়দ আহমদ হোসেনের কাছ থেকে অনুষ্ঠান শেষে আমি কবিতাটি নিয়ে নেই এবং আবদুল লতিফকে সুর করতে দেই। আবদুল লতিফের সুরে ঐ কবিতা প্রথম গান হয়ে ওঠে আতিকুল ইসলামের কণ্ঠে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবসে' ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানে ঐ গান গেয়ে আর ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার তুলে আতিকুল ইসলাম এবং আরো কয়েকজন কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে আলতাফ মাহমুদ গানটি আবদুল লতিফের কাছ থেকে শিখে নেন এবং আরো পরে নতুন করে সুর করেন। এখন আলতাফ মাহমুদের সুরেই গানটি গীত হয়। একুশের প্রথম গান শুধু একুশের স্মৃতিচারণ নয় বরং তার স্তবকে স্তবকে যে প্রশ্ন, যে জবাব তা ছিল সেদিনকার জিজ্ঞাসা ও উত্তর ঃ

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি ?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী !!

রচনাটির একটি স্তবকে একটি দেশের উল্লেখ আছে আর আছে সে দেশের নাম, একুশের কোন রচনায় স্বদেশের নামোল্লেখ বোধকরি এই প্রথম।

এই স্তবকে আরো উল্লিখিত হয়েছে, আর এক শ্রেণীর মানুষের কথা ঘৃণার সঙ্গে :

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের ভাইয়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলী ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী !!

একুশের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যে কবিতাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তার কয়েকটিতে আবেগের যে পরিচর্যা পাওয়া গেল পরবর্তীতে রচিত কবিতা-গুলিতে তার অনুরণন ছাড়াও নব নব প্রেক্ষাপট যুক্ত হয়েছে। প্রতি বছর একুশেতে প্রকাশিত সংকলনগুলিতে সে পরিচয় ছড়িয়ে আছে, পরে রচিত কবিতাগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই একুশের স্মৃতি দূরাগত। কিন্তু শহীদ স্মৃতির অমরতা অমলিন। ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার চেতনা, মাতৃভূমি তথা বাংলাদেশের অস্তিত্ব আর সামগ্রিকভাবে মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। বাংলা ভাষা তথা বাংলা বর্ণমালা বাঙালীর সত্তায় ইতিমধ্যে যে আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সগৌরব পরিচয়, শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতায় :

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই।

বায়ান্ন থেকে উনসত্তরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র অনেক চক্রান্ত গেছে। বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদের প্রয়াস কবিকে একটা সময়ে ব্যথিত করেছিল, বাংলা বর্ণমালাকে বায়ান্নর একুশের স্মৃতির ধারক ও বাহকরূপে চিহ্নিত করে কবি বেদনার্ত হয়ে লিখেছিলেন :

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ?
উনিশ শো' বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহিয়সী।
সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে
কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,

এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষ মাস !
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ।।

কিন্তু কবির ঐ হতাশা, নৈরাশ্য, বেদনা কেটে যায় ঊনসত্তরের মহান গণ-অভ্যুত্থানে, শামসুর রাহমানের 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯' কবিতাতে 'ফেব্রুয়ারী ১৯৫২' ফিরে আসে নবগৌরবে। একুশের শহীদেরা বিগত সতেরো বছর কবিতা ও গানে যেভাবে উচ্চারিত হয়েছিল তাতে একটা একঘেয়েমি, একটা গতানুগতিকতা এসে গিয়েছিল। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে তারা আবার নতুন করে সৃষ্টি হল, শামসুর রাহমানের ভাষায় ঃ

বুঝি তাই উনিশশো ঊনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

লক্ষণীয়, যে শামসুর রাহমান বাংলা বর্ণমালা নিয়ে 'খেঙরার নোংরামি', 'খিস্তি-খেউড়ের পৌষ মাস' প্রত্যক্ষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'। সেই কবি ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে রাজপথে নেমে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঐ হতাশা আর নৈরাশ্য থেকে মুক্তি লাভ করে বলেছেন ঃ

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।

আমাদের মাতৃভাষা, যার নাম বাংলাভাষা একুশে ফেব্রুয়ারীর জন্ম দিয়েছিল, বিনিময়ে একুশ দিয়েছে আমাদের মাতৃভূমি. আমাদের স্বদেশ, তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রত্যয়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই ফজল শাহাবুদ্দীন কবিদের পক্ষ থেকে, 'বাংলা ভাষা, মা আমার' কবিতায়, বাংলা ভাষার কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন ঃ

আর বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে নদীতে পাহাড়ে
শুনলাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ
গভীর বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ উদ্দীপিত এক বিপুল প্রত্যয়ে
মানুষের চিরদিনের সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে
মেতে উঠেছে...
হে বাংলা ভাষা আমার, আমি চিরকাল তোমার কাছে
কৃতজ্ঞ থাকবো
তুমি না হলে মানুষের এই উজ্জীবিত অভ্যুত্থানের কথা
আমি কোনোদিন উচ্চারণ করতে পারতাম না।

একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু কবিদের শেখায়নি 'মানুষের উজ্জীবিত অভ্যুত্থানের কথা' এ দেশের মানুষকেও তা শিখিয়েছে, বায়ান্ন থেকে ঊনসত্তর, ঊনসত্তর থেকে একাত্তর সময়ের এই পরিধিতে এ দেশের মানুষের যে রূপান্তর, নির্মলেন্দু গুণ-এর 'আমাকে কী মাল্য দেবে দাও' কবিতাতে তারই চিত্র,

কবরের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই কবর
শহীদের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই শহীদ
আমার আঙুল যেন শহীদের অজস্র মিনার হয়ে
জনতার হাতে হাতে গিয়েছে ছড়িয়ে,
আমার কিসের ভয় ?

একুশের প্রথম নাটক 'কবর', মুনীর চৌধুরী রচনা করেন ১৭-১-৫৩ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ভাষা আন্দোলনের রাজবন্দী মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের শহীদদের নিয়ে নাটকটি রচনা করেছিলেন সহ-রাজবন্দীদের অনুরোধে, ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে। গোরস্তানে শহীদদের কবর দেওয়া নিয়ে বিপত্তি বাধায় গোর-খুঁড়েরা। সে অবস্থায় সরকারী নেতা ও ইন্সপেক্টর হাফিজের সংলাপ ঃ

নেতা ঃ এর মধ্যে গোলমালটা কিসের ? আপত্তি উঠলো কোথায় ?

হাফিজ ঃ এ্যা ? ওহ্। ইয়ে—মানে, ঐ গোরখুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা "কভি নেহি।" বলে কিনা 'মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না। এ হতে পারে না, কভি নেহি। গোঁ ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।"

শুধু গোরখুঁড়েরাই নয়, কবরের বাসিন্দা মুর্দাফকিরও কবর দেওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুর্দা ফকিরের পরিচয় ঃ

হাফিজ ঃ লোকটা এমনিতে ভাল লেখাপড়া জানে। ভাল আলেম। গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে

মেয়ে মা-বৌকে মরতে দেখেছে কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শিয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্তান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে ঃ মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে কাছাকাছি থাকবে। চট করে যাতে কবরে ঢুকে যেতে পারি।...

নেতা ঃ গুলী চলেছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড়-ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পোঁছেনি তা ভাবতে আমি রাজী নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ ঃ মুর্দা ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ও ত এক-রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবীতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে গুলী করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে এত কথা বোঝবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ওর মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়—কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল।...

নেতা ঃ ওটাকে সুদ্ধো পুঁতে দাও।...পুঁতে ফেল। দশ পনেরো বিশ পঁচিশ হাত যত নীচে পারো একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনদিন যেন আর উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

কিন্তু মুর্দা ফকিরের ধারণা অন্য রকম। সে নেতা আর ইন্সপেক্টরকে বলে ঃ

ফকির ঃ বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না ? এ লাশের গন্ধ অন্যরকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ পঁচিশ ত্রিশ হাত যত নীচেই মাটি চাপা দাও না কেন এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

ফকিরের ধারণা লাশদের নয়, বরং এদেরই কবরে দেওয়া উচিত।

ফকির ঃ গন্ধ ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ। তোমরা এখানে কি করছো ? যাও তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না। না না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। তোমাদের গায়ে মুখে-পাই মরার গন্ধ ! তোমা-দের সময় হয়ে গেছে।...আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরী হয়ে নাও।...

গুলী খাওয়া লাশ যখন কবর থেকে উঠে আসে তখন নেতার সংলাপ ঃ

নেতা ঃ জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, যারা এখনো মরেনি—তাদের নামে—মিনতি করছি—তুমি যাও, যাও, যাও।

হাফিজ যখন মা সেজে লাশের কথা বলে তাকে কবরে পাঠাবার চেষ্টা করে তখন মায়ের সঙ্গে শহীদের সংলাপ ঃ

মূর্তি ঃ তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাঁপসা হয়ে এল। আমার তখন খালি কি মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো।

হাফিজ ঃ তবু তো কোন কথা শুনিস না। তোরা কেবল মার দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস! এ তোদের কি নতুন নেশা। এত মরণ-পাগল কেন তোরা।

মূর্তি ঃ মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না?

হাফিজ ঃ লক্ষ্মী বাবা, বিছানা করে রেখেছি! যাদু আমার শুতে যা।

মূর্তি ঃ আমাকে শুতে যেতে বলছো মা? না। না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না মা। আমি আর কোনদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না।...না আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

লাশগুলো কবরে ফিরে যেতে অস্বীকার করলে নেতার আদেশ এবং মুর্দা ফকিরের সংলাপ ঃ

নেতা ঃ ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানি না। আমি স-ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলী করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবো। যাতে কোন-দিন উঠতে না পারে। গুলী, সবাইকে আবার গুলী করো। গার্ড! গার্ড!

ফকির ঃ জী হুজুর।

নেতা ঃ গুলী করো।

ফকির ঃ গুলী? ওহ! হ্যা! আছে। আমার কাছে আরো কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা। টাটকা। এখনও খুন লেগে

রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন।...লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। মিছিলটা এইদিকে ডেকে নিয়ে আসি।... তোরা কোথায় গেলি ? সব ঘুমিয়ে নাকি ? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলী গুলী হবে। স্ফূর্তি করে আয় সব। কোথায় গেলি ? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলী—গুলী হবে আজ। কবর খালি করে সব উঠে আয়। বায়ান্ন সালের একুশের ঘটনা নিয়ে মুনীর চৌধুরীর ঐ সংলাপের বাস্তবতা একাত্তরে আমরা দেখেছি।

'কবর' নাটকের সংলাপ বাঙালীর জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল ঐ নাটক রচনার বিশ বছরের মধ্যেই, সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল তার নিজের জীবনেও। বস্তুত 'কবর' নাটকের সংলাপে মুনীর চৌধুরী তার ও স্বজাতির ভবিষ্যতকেই তুলে ধরেছিলেন। একাত্তরে নয়টি মাস ধরে বাংলার দিকে দিকে সৃষ্ট অসংখ্য গণ-কবর আর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রায়ের বাজার বধ্যভূমি এরই সাক্ষ্য দেয় না কি ?

একুশের শহীদ ও স্মৃতির মিনার

একটি অপূর্ব ও অপূর্ণ স্বপ্ন

বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে, বাইশে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকালে হাইকোর্টের সামনের রাস্তায় আর দুপুরে রথখোলা ও 'সংবাদ' অফিসের কাছে বাংলা ভাষার দাবীতে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা কত? তাঁরা কারা? কী তাঁদের পরিচয়? বিরাশি সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বায়ান্ন'র একুশের ত্রিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে; অথচ এই ত্রিশবছরের মধ্যেও আমরা বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি। ঐ বিষয়ে বাংলা একাডেমীর অনীহা অমার্জনীয়।

বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারী মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে যা ঘটেছিল তা আমরা স্মৃতি এবং একুশে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় প্রকাশিত আজাদ পত্রিকার টেলিগ্রাম ও বাইশে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারি। ভাষার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রজনতার ওপরে মেডিকেলের মোড়ে অবস্থানরত ঢাকার তদানীন্তন অবাঙালী ডি, সি, কোরেশী এবং সি, টি, এস, পি মাসুদের কর্তৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী কয়টার সময় গুলাবর্ষণ করেছিল? 'আজাদ' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় অপরাহ্ণ প্রায় চারটার সময়, আমাদেরও মনে হয় তিনটা থেকে চারটার মধ্যে প্রথম গুলী চলে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকায়, মেডিকেলের সামনের রাস্তায় এবং মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে (এখন যেখানে ডিসপেনসারী, শহীদ মিনার ও নার্সদের আবাস) সকাল এগারটার পর থেকেই ক্রমাগত প্রচণ্ড লাঠি, ফাঁকাগুলি ও কাঁদানে গ্যাস চলছিল। ফলে আহতদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল এবং মেডিকেলের ইমারজেন্সিতে স্থানাভাব ঘটেছিল।

'আজাদ' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, মেডিকেলের মোড় থেকে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ভাষার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রজনতার ওপরে গুলি বর্ষণের ফলে একুশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালিয়ের এম, এ ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (২৬)

ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং বহুসংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত্রি ৮ টার পর আহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আবদুল জব্বার (৩০) আবুল বরকত (২৫) ও বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকউদ্দিন আহমদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিবার জন্যে ছাত্রদল পরিষদ ভবনের দিকে যাইতে চাহিলে হঠাৎ একদল পুলিশকে হোস্টেল অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে দেখা যায় এবং তাহারা হোস্টেলের বাহিরে ও ভিতরে গুলি চালাইতে থাকে। গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলের ভিতর একটি মোড়ের বারান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সালাউদ্দিনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি বুলেট তাহার কপালে বিদ্ধ হইয়া মাথার খুলি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রচুর রক্তে ১২ নম্বর শেডের বারান্দার প্রশস্ত অংশ রঞ্জিত হইয়া উঠে। বহু ছাত্রকে আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় ২০ নম্বর শেডের বারান্দা ও হোস্টেল প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কয়েকটি বুলেট ২১ নম্বর শেডের দেয়াল ছেদ করিয়া কামরার মধ্যে প্রবেশ করে।...কয়েকটি কামরায় রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়।"

মেডিকেল কলেজের সামনের গাড়ী বারান্দায় এম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে ইমারজেন্সিতে নেওয়ার সময় মস্তকে গুলীবিদ্ধ ব্যক্তিটিকে দেখেছিলাম, তার মগজ গড়িয়ে পড়ছিল, মাথা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। 'আজাদ' পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে মস্তকে গুলীবিদ্ধ ঐ ব্যক্তি ছিলেন সালাউদ্দিন। কিন্তু ১৯৮০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত আহমেদ নূরে আলমের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের মতে, "একুশে ফেব্রুয়ারী প্রথম গুলীবর্ষণে রফিক ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। গুলী লাগে তার মাথায়। তার মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল।...রফিকের বয়স ছিল উনিশ বা কুড়ি বছর। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের আই, কম দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামের মরহুম মোঃ আবদুল লতিফের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি। শহীদ-জননী রাফিজা খানম এখনও জীবিত। তার বয়স প্রায় ৭৫ বছর। গ্রামেই থাকেন তিনি। ঢাকা থেকে মাত্র ১৮ মাইল দূরে হলেও শহীদ-জননী গত ২৮ বছরে একবারও পুত্রের কবর দেখেননি। কারণ শহীদ রফিককে দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানের অসংরক্ষিত

এলাকায়। পরেও তাঁর কবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে সেখানে নতুন কবর পড়েছে।...সাতদিন আগে তার বিয়ের পানচিনি হয়েছে।"...শহীদ রফিকউদ্দিনের কবর মুছে গেছে কিন্তু নাম মুছে যায়নি। কিন্তু ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সালে 'আজাদ' পত্রিকার প্রতিবেদনে প্রকাশিত সালাউদ্দিনের নাম বা কবর কোন কিছুরই আর নিশানা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম, এ, শেষপর্বের ছাত্র আবুল বরকত গুলীবিদ্ধ হলে তাকে যারা মেডিকেল হোস্টেল থেকে ইমারজেন্সিতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের একজন শামসুল বারী ওরফে মিয়া মোহন (বর্তমানে আইনজীবী) বরকতের গুলীবিদ্ধ হওয়ার যে লিখিত বিবরণ আমাকে দিয়েছিলেন তা থেকে বরকতের কথা জানা যায়, "হোস্টেল প্রাঙ্গণে তখন অনেক ছাত্র এসে গেছে আটকা পড়ে গেছি সবাই বুলেট আর ইটের লড়াইতে।...সিগ্রেট ধরিয়ে ২০ নং ব্যারাকের মাঝা-মাঝি কামরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছিলাম। আমার দিকে এগিয়ে এলেন 'বরকত' ডাক নাম 'আবাই',...আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি কিন্তু পড়ে গেলেন সাথে-সাথে আমার হাতখানেক দূরে। পুলিশ ঢুকে পূর্ব থেকে সোজা গুলী ছুঁড়েছে। শফিকুর রহমান ১৭ নম্বরে থাকতেন, দৌড়ে এসে পানি ঢেলে দিলেন। ভেবেছিলেন টিয়ার-গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। আমি গুলীর কথা বললাম। ততক্ষণে পানির সাথে রক্ত দেখা দিয়েছে, বারান্দার মেঝেতে। তলপেটের নীচে উরুতে লেগেছে গুলী। গায়ে ছিল তার নীল রঙের ফ্লাইং সার্ট। পরনে খাকী প্যান্ট, পায়ে কাবলী স্যান্ডেল। তখন তার দুই ঠ্যাং শফিকুর রহমান কাঁধে তুলে নিলেন আর মাথা নিলাম আমার কাঁধে। আমরা পশ্চিম দিক দিয়ে একটু ঘুরে দৌড়াতে লাগলাম তার দীর্ঘ সুঠাম দেহটা নিয়ে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো তারও কোমর নীচের দিকে ঝুলে দুমরে টপ্‌টপ্‌ রক্ত ঝরছিলো। আমার কাছে পানি চাইল কিন্তু কোথায় পানি, সময় নাই, পুলিশ দেখলে কেড়ে, নিতে পারে, তাই পড়ি-মরি করে ছুটছি। ভেজা রুমালটা দিলাম চুষতে।...সে বলল খুব কষ্ট হচ্ছে, বাঁচব না, বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টনে সংবাদ পৌঁছে দেন। তাকে নিয়ে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে নামালাম। কেউ-কেউ কেঁদে ফেলল, একজন নার্স কাপুরুষ বলে গালাগালি দিয়ে প্রতি-শোধ নেবার জন্যে গেটে যেতে বললেন। আমি দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ষ্ট্রেচারে করে একজনকে মৃত আনতে দেখলাম। মাথার খুলি উড়ে গেছে, নিচের দিকে খানিকটা ঘিলু ঝুলছে। শুধু দাঁত-

গুলি দিয়ে হাসছে যেন আমার দিকে তাকিয়ে।"...গুলীবিদ্ধ আবুল বরকতকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপারেশন করা হয়েছিল কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। একুশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে মেডিকেল কলেজ হস্টেল প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলীতে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের লাশ ছাত্র বা আত্মীয়দের দেওয়া হয়নি, সে রাতেই তাদের আজিমপুর গোরস্থানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কারফিউর মধ্যে দাফন করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলীতে কয়জন শহীদ হয়েছিলেন? আমরা তিনজনের নাম ও মৃত্যুর বিবরণী দিতে পেরেছি। নুরুল আমিনের সরকারী প্রেস নোটেও কিন্তু তিনজনের মৃত্যু সংবাদ স্বীকার করা হয়েছিল, "মারমুখী জনতা পুলিশের দিকে ধাবিত হইলে জেলা মেজিস্ট্রেটের নির্দেশে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়া হয়। অতঃপর গুলী ছোঁড়া বন্ধ করা হয়। কিন্তু উহাতে ছত্রভঙ্গ না হইয়া জনতা পুনরায় পুলিশ-বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, ফলে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়া হয়। উহাতে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। সরকার দুঃখের সহিত জানাইতেছে যে, ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন এবং গুলীর আঘাতে যে ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তন্মধ্যে দুইজন রাত ৮ টার সময় মৃত্যু মুখে পতিত হন।" বোঝা যাচ্ছে যে, বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানোর অপরাধে পুলিশ যাদের ওপরে গুলী চালিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্তত তিনজন সেদিন রাত আটটার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় একুশের শহীদদের মধ্যে আবুল বরকত ছাড়া কারো কবরের কোন চিহ্ন নেই। বস্তুত একুশে ফেব্রুয়ীতে মৃত্যুর সংখ্যা তিনের অধিক ছিল এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল কিশোর। এ-প্রসঙ্গে ৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে 'আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ, "বৃহস্পতিবারের ঘটনা সম্পর্কে শহরে প্রবল গুজব যে ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয়। একটি কিশোর বয়স্ক বালক সম্বন্ধে অনুরূপ গুজব শুনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পরে জানা যায় যে, বালকটি মেডিকেল কলেজ ও পরিষদের মধ্যে ফুলার রোডে গুলীতে নিহত হয় এবং তাহার লাশ তৎক্ষাৎ অপসারিত হয়।"

বায়ান্ন'র বাইশে ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন কলাভবন বা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ ছিল না তা' ছড়িয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরময়, বাইশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা শহরে কি

ঘটেছিল তা জানা যায় তেইশে ফেব্রুয়ারীতে 'আজাদ' পত্রিকায়, প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে, "বৃহস্পতিবারের শোচনীয় ও ভয়াবহ ঘটনা বিস্মৃত হইতে না হইতে গতকল্য (শুক্রবার) জুম্মার দিন আর একবার ঢাকার মাটি শিশু ও ছাত্রের রক্তে লাল হইয়া ওঠে—সেদিনকার ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শান্তিপূর্ণ মিছিল বাহির করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের গুলির আঘাতে নাগরিকদের ৪ জনকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় এবং শতাধিক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে নিতে হয়। তাহাদের ১৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।...এইদিন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনার পর...ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা হেস্টেল প্রাঙ্গণ হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছিলে পুলিশ ও সৈন্যরা তাহাদের উপর লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলেই কয়েকজন হতাহত হয়। শোভাযাত্রাটির সম্মুখভাগে নিহত ও হতাহতদের রক্তমাখা জামা-কাপড় ইত্যাদি দেখানো হইয়াছিল।...বেলা প্রায় এগারোটার সময় রথখোলা ও নিশাত সিনেমা হলের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষমান নিরীহ পথচারীদের ওপরে বেপরোয়াভাবে গুলি চালান হয়...ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত ও দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে বেয়নেট দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয়...সকালের দিকে নওয়াবপুর রোডের বিভিন্ন স্থানে সামরিক লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালায় ...।"

বায়ান্ন'র বাইশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার রাজপথে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে যে চারজনকে প্রাণ দিতে হয় তাদের মধ্যে হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান ছাড়া আর কারো নাম বা পরিচয় আমাদের জানা নেই। শফিউর রহমানের কবর ছাড়া আর কারো কবরেরও অস্তিত্ব নেই। আমাদের ধারণা ছিল শফিউর রহমান হাইকোর্টের সামনে গুলীবিদ্ধ হন কিন্তু ১৯৮০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত আহমেদ নূরে আলমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে তিনি নওয়াবপুর রোডে, গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন, শফিউর রহমানের ছোটভাই তৈয়বুর রহমানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছেন "শহীদ সফিউর ছিলেন হাইকোর্টের একজন কর্মচারী···তিনি ছিলেন বিবাহিত এবং শিশুকন্যার পিতা। শফিউর রহমানের শাহদাতের তিন মাস পরে তাঁর পুত্র সন্তানের

জন্ম হয় পুত্রের নাম রাখা হয় শফিকুর রহমান। শহীদের পত্নী আকিলা বেগম। ২১শে ফেব্রুয়ারী গুলীবর্ষণ সীমিত ছিল বিশ্ব-বিদ্যালয় এলাকায়। কিন্তু ২২শে ফেব্রুয়ারীতে তা ছড়িয়ে পড়ে শহরের সর্বত্র।...সকালে মেডিক্যাল কলেজের হোষ্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবী জানাজায় লক্ষাধিক লোক যোগ দেন।...জানাজা শেষে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে এলে এর ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ হয়। এখানে এক ব্যক্তি শহীদ হন (এখানে যিনি শহীদ হয়েছিলেন তাঁকে শফিউর রহমান বলে মনে করা হয়। কিন্তু তৈয়বুর রহমান বলেছেন যে, তার ভাই সেখানে গুলিবিদ্ধ হননি)...সকাল ১১টা কি সোয়া ১১টার দিকে তিনি বেরিয়েছিলেন। তখন এক বিরাট মিছিল যাচ্ছিল নওয়াবপুর রোড দিয়ে। মরণ চাঁদের দোকানের সামনে যখন তিনি, তখন গুলী হয়। গুলী লাগে তার পিঠে। তবুও সাইকেল চালিয়ে তিনি কিছুটা যান, কিন্তু খোশমহল রেণ্টুরেন্টের সামনে এসে পড়ে যান। তাঁকে ধরাধরি করে রেষ্টুরেণ্টের মধে নিয়ে যাওয়া হয়।... এখান থেকেই তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয় এম্বু-লেন্সে করে।...বেলা আড়াইটা কি পৌণে তিনটার সময় আমাদের বাসার সামনে একটা এ্যামবুলেন্স আসে...মা ভাবী শাহনাজ (মেয়ে) ও আমি গিয়েছিলাম।...ইশারা ক'রে বড়ভাই মাকে ডাকলেন, দুহাত বাড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের কাপড়ে রক্ত লেগে গেলো। এরপর আমাকে ডাকলেন কাছে জড়িয়ে ধরলেন। ভাবী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। এরপর ভাইকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো দেখলাম। সন্ধের সময় তিনি মারা যান। গুলীতে ভাইয়ের কলজে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। অপারেশন সফল হয়নি তাই। পুলিশ আমাদেরকে লাশ দেয়নি। সেদিন রাত তিনটায় আজিমপুরে তাকে দাফন করা হয়। তবে অনেক ধরাধরি করে আমরা লাশের কাফন পরিয়ে দিতে পেরেছিলাম"।

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সাধনা ও সংগ্রাম বা ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার যা গৌরবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। কিন্তু এ-শহীদ মিনারেরও একটা ইতিহাস আছে, যে ইতিহাস ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারীর ত্রিশ বছর পুরো হওয়ার আগেই অনেক বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে শহীদ মিনারের ইতিহাস নিয়ে। বিরাশি সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলাভাষার জন্যে, মাতৃভাষার

জন্যে বাঙালীর রক্তদানের ত্রিশতম বার্ষিকী, সে দিনটি আসার আগেই তুলে ধরতে চাই শহীদ মিনার সম্পর্কে যথার্থ তথ্যাবলী যাতে আগামী শহীদ দিবসে কোন বিভ্রান্তি না থাকে শহীদ মিনারের ইতিহাস নিয়ে।

বাংলাভাষার জন্যে বাঙালী রক্ত দিয়েছিল বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে, রক্ত দিয়েছিল বাইশে ফেব্রুয়ারী পুরাতন হাইকোর্ট ও কার্জন হল মধ্যবর্তী রাস্তায়, নবাবপুর রোডে, বংশাল আর রথ-খোলার মোড়ে। একুশের শহীদ আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, সালাউদ্দিন ও নাম না জানা কিশোর, বাইশে ফেব্রুয়ারীর শহীদ শফিউর রহমান, রিক্শা চালক আউয়াল এবং নাম না জানা আরো দু'জন, এদের কারো লাশ সেদিন আন্দোলনরত ছাত্র জনতা পায়নি। নিহতদের কবর দেওয়া হয়েছিলো গোপনে রাতের আঁধারে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু বরকত ও শফিউর রহমান ছাড়া আর সবার কবর হারিয়ে গেছে সেদিনের স্বৈরাচারী শাসকের চক্রান্তে। সেদিন শ্লোগান সৃষ্টি হয়েছিলো 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' কিন্তু শহীদ স্মৃতিকে অমর ক'রে রাখার জন্যে প্রতীক চাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উদয় হয়েছিল শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ বা শহীদ মিনারের স্বপ্ন। আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল বায়ান্ন'র তেইশে ফেব্রুয়ারী রাতারাতি। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মেডিকেল কলেজের অন্যতম কর্মী আহমদ রফিকের ভাষায় প্রথম শহীদ মিনার "এক আকস্মিক চিন্তার যৌথ ফসল, তেমনি এর সমাপনও সমষ্টিগত শ্রমের এক আশ্চর্য ফসল।"

প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ সম্পর্কে বায়ান্ন'র ভাষা-আন্দোলনের মেডিকেল কলেজের অপর কর্মী সাঈদ হায়দার লিখেছেন, "এটাকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা পরিকল্পনা বলা চলে। দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র শহীদ মিনার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারীর রাত থেকেই শহীদ মিনার তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আর ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে শহীদ মিনার তৈরীর কাজ শুরু হয়। ২৩ তারিখ বিকেল থেকে শুরু করে সারারাত সেখানে কাজ হয় (কার্ফু থাকা সত্ত্বেও)...ইট-বালির কোনো অভাব ছিলো না। মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইট বালি ছিল। ছাত্ররাই ইট বয়ে এনেছে। বালির সাথে সিমেন্ট মিশিয়েছে।

দুজন রাজমিস্ত্রী ছিল। তাদের নাম বলতে পারব না। আমাদের মেডিকেল হোস্টেলে প্রায় তিনশ' ছাত্র ছিল। তাদের সকলেই সেদিন কোন-না-কোন কাজ করেছিল। আর শহীদ মিনারের নক্শা তৈরী করেছিলাম আমি। শহীদ মিনারের কাজ শেষ হলে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল এবং নক্শাটি সেখানেই টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল।...শরফুদ্দীন (তাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার বলতাম। সে ভাল অংক জানতো...) শহীদ মিনার নির্মাণের কাজে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিল। এ-ছাড়া মাওলা, হাশেম, জাহেদ, আলিম, জিয়া আরও অনেকে শহীদ মিনার নির্মাণে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। এ-ছাড়া ছিল আমাদের অনেক বয়-বেয়ারা এরাই ছিল সেদিনকার বড় কর্মী। নকসায় সাড়ে ন'ফুটের পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ করার পর দেখা গেল মূল পরিকল্পনাকে তা' ডিঙিয়ে গেছে। মিনারটি সম্ভবতঃ ১১´ ফুট তৈরী হয়েছিল। বদরুল আলমও মিনার নির্মাণে সাহায্য করেছিল তার হাতের লেখা ছিলো চমৎকার। কাগজে লিখে মিনারের গায়ে সেঁটে দিলে মর্মর পাথরের মত দেখাতো। আজকের শহীদমিনার যেখানে, প্রায় তার কাছাকাছি মিনারটি তৈরী করা হয়েছিল।...শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে এনে ২৪শে ফেব্রুয়ারি মিনারটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। আমি সেখানে ছিলাম। পরবর্তী সময়ে আবুল কালাম শামশুদ্দীন সাহেব নাকি উদ্বোধন করেছিলেন তবে তা হয়ত আরো আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্য কালাম সাহেবকে দিয়ে পুনরায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে থাকবে।..."

সাইদ হায়দারের নক্শায় ও বদরুল আলমের রেখায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারটি ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকালে শহীদ শফিউর রহমানের পিতা আর ২৬শে সকালে আবুল কালাম শামসুদ্দীন উদ্বোধন করেছিলেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকালের মধ্যেই এ-মিনার হয়ে উঠেছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক তীর্থ কেন্দ্র। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার কালো হাত এটা মেনে নিতে পারেনি তাই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী দুপুর ও অপরাহ্নের মধ্যেই নাজিমুদ্দিন-নুরুল আমিনের সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশে বাঙালীর প্রথম শহীদ মিনারটি আক্ষরিক অর্থে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে এর মধ্যেই বাঙালীর হৃদয়ে যে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিল তা নিশ্চিহ্ন করার শক্তি কোন শাসকের নেই, আলাউদ্দিন আল আজাদের ভাষায়, "স্মৃতির মিনার ভেঙেছে

তোমার ?...ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগর...রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।" তাই তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন, ঊনষাট, ষাট, একষট্টি, বাষট্টি দশটি বছরের প্রথম তিনটি বছর নিশ্চিহ্ন মিনারের কাপড় ঘেরা স্থানটি আর বাকি সাতটি বছর শহীদ মিনারের জন্যে স্থাপিত ভিত্তিটিই ছিলো এদেশের মানুষের শহীদ মিনার, তিপ্পান্ন থেকে তেষট্টি প্রতিটি সংগ্রামে বাঙালী শপথ নিয়েছে ঐ স্মৃতির মিনারে যা বাঙালীকে দিয়েছে অবিরাম সংগ্রামের অন্তহীন প্রেরণা। চুয়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর' 'যুক্তফ্রন্ট' একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রতীক একুশ দফায়, শহীদ মিনার নির্মাণ, একুশকে শহীদ দিবস ঘোষণা, রাস্ট্রভাষা বাংলা ঘোষণা ও নুরুল আমিনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমী করার শপথ নিয়ে বিজয়ী হয়েছিল। চুয়ান্ন সালের ২রা এপ্রিল গঠিত হয়েছিল শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে সে সরকার পঁয়তাল্লিশ দিনের বেশী স্থায়ী হতে পারেনি, শেরে বাংলাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মুহাম্মদ আলি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন। ঐ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করে যেতে পারেনি। পঞ্চান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে সরকারী ছুটি বাতিল করা হয়, বাধা দেওয়া হয় শহীদ দিবস পালনে, শহীদানের কবর ও শহীদ মীনারে যেতে।

যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিল, কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন পঞ্চান্ন সালের আগষ্ট মাসে আর ক্ষমতায় ছিলেন ছাপান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৎসরাধিককাল, সে সময়ে পূর্ববাংলায় বিরোধী দল মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার ক্ষমতায় এসেছিলেন ছাপান্ন সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর এবং ক্ষমতায় ছিলেন আটান্ন সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত। আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রিত্বের সময় অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের আমলে যথাক্রমে 'শহীদ মিনার' এর ভিত্তি ও মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল আবু হোসেন সরকারের মুখ্য মন্ত্রিত্বের আমলে ছাপ্পান্ন সালের একুশে

ফেব্রুয়ারীতে। শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদে লেখা হয়, "এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হইয়াছে যে, পূর্ত সচিব (মন্ত্রী) জনাব আব্দুস সালাম খান মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চুড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করিয়াছেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া উহা 'যত সত্বর সম্ভব সরকারের নিকট পেশ করার জন্য' সরকারী স্থপতিকে নির্দেশ দিয়াছেন।"

পূর্ত মন্ত্রী কর্তৃক শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং পরের দিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারীতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন তদারক করার সংবাদটিতে প্রচার হয়ে পড়ে যে "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের যে স্থানটিতে পুলিশের গুলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হইয়াছিলেন সেখানে সরকার রাতারাতি একটি 'শহীদ মিনার' গড়িবার আয়োজন করিতেছেন। খবরটি প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এক বিরাট জনতা ঘটনাস্থলে ভিড় জমাইয়া দেখিতে পায় যে জনৈক মন্ত্রী প্রস্তাবিত মিনারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জনতা ইহাতে প্রবল আপত্তি জানায়... ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিক্সাচালক আওয়ালের ৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা বসিরনকে দিয়া জনতা ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়।" ...এভাবে ছাপান্ন সালের বিশে ফেব্রুয়ারী রাতে জনতা বায়ান্নর শহীদ আওয়ালের কন্যা বসিরনকে দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান শহীদ মীনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়।

এদিকে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে এই মর্মে পূর্ব বঙ্গ সরকারের একটি প্রেস নোট প্রকাশিত হয় যে "অদ্য ৯টায় মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন।" এ-ছাড়া আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা পূর্ব বাংলায় 'সরকারীভাবে' প্রথম 'শহীদ দিবস' পালন এবং 'দিবস'-টিকে সারকারী ছুটির দিন ঘোষণা করেন।

ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ায়ী সকালে বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয় এবং তা করেন পূর্ব বাংলার তদানীন্তন মুখ্য মন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মাতা হাসিনা বেগম। ঐ প্রসঙ্গে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় ছাপ্পান্ন সালের তেইশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন, "সকাল

ফেব্রুয়ারীতে। শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদে লেখা হয়, "এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হইয়াছে যে, পূর্ত সচিব (মন্ত্রী) জনাব আব্দুস সালাম খান মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করিয়াছেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া উহা 'যত সত্বর সম্ভব সরকারের নিকট পেশ করার জন্য' সরকারী স্থপতিকে নির্দেশ দিয়াছেন।"

পূর্ত মন্ত্রী কর্তৃক শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং পরের দিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারীতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন তদারক করার সংবাদটিতে প্রচার হয়ে পড়ে যে "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের যে স্থানটিতে পুলিশের গুলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হইয়াছিলেন সেখানে সরকার রাতারাতি একটি 'শহীদ মিনার' গড়িবার আয়োজন করিতেছেন। খবরটি প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এক বিরাট জনতা ঘটনাস্থলে ভিড় জমাইয়া দেখিতে পায় যে জনৈক মন্ত্রী প্রস্তাবিত মিনারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জনতা ইহাতে প্রবল আপত্তি জানায়... ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিক্সাচালক আওয়ালের ৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা বসিরনকে দিয়া জনতা ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়।" ...এভাবে ছাপান্ন সালের বিশে ফেব্রুয়ারী রাতে জনতা বায়ান্নর শহীদ আওয়ালের কন্যা বসিরনকে দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান শহীদ মীনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়।

এদিকে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে এই মর্মে পূর্ব বঙ্গ সরকারের একটি প্রেস নোট প্রকাশিত হয় যে "অদ্য ৯টায় মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন।" এ-ছাড়া আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা পূর্ব বাংলায় 'সরকারীভাবে' প্রথম 'শহীদ দিবস' পালন এবং 'দিবস'-টিকে সারকারী ছুটির দিন ঘোষণা করেন।

ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয় এবং তা করেন পূর্ব বাংলার তদানীন্তন মুখ্য মন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মাতা হাসিনা বেগম। ঐ প্রসঙ্গে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় ছাপ্পান্ন সালের তেইশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন, "সকাল

তোমার ?...ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগর...রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।" তাই তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন, ঊনষাট, ষাট, একষট্টি, বাষট্টি দশটি বছরের প্রথম তিনটি বছর নিশ্চিহ্ন মিনারের কাপড় ঘেরা স্থানটি আর বাকি সাতটি বছর শহীদ মিনারের জন্যে স্থাপিত ভিত্তিটিই ছিলো। এদেশের মানুষের শহীদ মিনার, তিপ্পান্ন থেকে তেষট্টি প্রতিটি সংগ্রামে বাঙালী শপথ নিয়েছে ঐ স্মৃতির মিনারে যা বাঙালীকে দিয়েছে অবিরাম সংগ্রামের অন্তহীন প্রেরণা। চুয়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর' 'যুক্তফ্রন্ট' একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রতীক একুশ দফায়, শহীদ মিনার নির্মাণ, একুশকে শহীদ দিবস ঘোষণা, রাস্ট্রভাষা বাংলা ঘোষণা ও নূরুল আমিনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমী করার শপথ নিয়ে বিজয়ী হয়েছিল। চুয়ান্ন সালের ২রা এপ্রিল গঠিত হয়েছিল শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে সে সরকার পঁয়তাল্লিশ দিনের বেশী স্থায়ী হতে পারেনি, শেরে বাংলাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মুহাম্মদ আলি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন। ঐ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করে যেতে পারেনি। পঞ্চান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে সরকারী ছুটি বাতিল করা হয়, বাধা দেওয়া হয় শহীদ দিবস পালনে, শহীদানের কবর ও শহীদ মীনারে যেতে।

যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিল, কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন পঞ্চান্ন সালের আগষ্ট মাসে আর ক্ষমতায় ছিলেন ছাপান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৎসরাধিককাল, সে সময়ে পূর্ববাংলায় বিরোধী দল মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার ক্ষমতায় এসেছিলেন ছাপান্ন সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর এবং ক্ষমতায় ছিলেন আটান্ন সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত। আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রিত্বের সময় অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের আমলে যথাক্রমে 'শহীদ মিনার' এর ভিত্তি ও মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল আবু হোসেন সরকারের মুখ্য মন্ত্রিত্বের আমলে ছাপ্পান্ন সালের একুশে

৯টায় পবিত্র কোরান তেলোয়াতের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের পার্শ্বে মওলানা ভাসানী, প্রধানমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার ও শহীদ বরকতের মাতা যুক্তভাবে 'শহীদ মিনার'-এর পার্শ্বে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে জনাব আবু হোসেন সরকার জুতা পায়ে আগমন করিলে উপস্থিত ছাত্র জনতার মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত জনাব সরকার জুতা খুলিতে বাধ্য হন।" এ-ভাবেই ছাপ্পান্ন সালের বিশে ফেব্রুয়ারী রাতে শহীদ আওয়ালের শিশু-কন্যা বসিরন অনানুষ্ঠানিকভাবে এবং একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে মওলানা ভাষানী, আবু হোসেন সরকার ও শহীদ বরকতের মাতা হাসিনা বেগম আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান শহীদ মিনা-রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পূর্ত মন্ত্রী আবদুস সালাম খান কর্তৃক শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যত সত্বর সম্ভব সর-কারের কাছে পেশ করার জন্যে সরকারী স্থপতিকে নির্দেশ দানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আবু হোসেন মন্ত্রিসভার আমলে শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের কাজ আর বিশেষ অগ্রসর হয়নি। ছাপ্পান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টির মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান পূর্ব বাংলায় প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেন। আওয়ামী লীগ চৌদ্দমাস অর্থাৎ আটান্ন সালের মার্চ মাসের শেষপর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, এ-সময়ে শহীদ মিনারের কাজ বেশ অগ্রসর হয়েছিল এবং সাতান্ন সালের তেসরা এপ্রিল আইন সভায় 'বাংলা একাডেমী এ্যাক্ট ১৯৫৭' পাশ হয়। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় সাতান্ন সালের দশই আগষ্ট আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রিত্বের আমলে শহীদ মিনারের পরি-কল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এম, এ, জব্বার এর ওপর। ছাপ্পান্ন সালের শরৎকালে শিল্পী হামিদুর রহমান শিল্পকলা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপন করে ইংলণ্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার জব্বার এবং শিল্পী জয়নুল আবদিন তাকে অনুরোধ জানান শহীদ মিনারের জন্যে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে। তাদের অনুরোধ অনুযায়ী শিল্পী হামিদুর রহমান শহীদ মিনারের একটি মডেল এবং বায়ান্নটি নক্শা ও পরিকল্পনার কাগজ-পত্র পেশ করেন। অন্যান্য শিল্পী ও স্থপতিরাও প্রতিযোগিতা-

মূলক নকশা দিয়েছিলেন কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক স্থপতি ডক্সিয়াডেস, চীফ ইঞ্জিনিয়ার জব্বার এবং শিল্পী জয়নুল আবেদিন সমবায়ে গঠিত নির্বাচন কমিটি হামিদুর রহমানের নক্সাটিকে অনুমোদন করেন। শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা অনুসারে সাতান্ন সালের নভেম্বর মাসে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং একটানা কাজ চালিয়ে আটান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শহীদ মিনারের ভিত্তি, মঞ্চ এবং তিনটি স্তম্ভ তৈরী সমাপ্ত হয়, এর মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ওপর হাজার বর্গ ফুটের একটি 'মুর‍্যাল' চিত্রের দুই স্তরের কাজ হামিদুর রহমান শহীদ মিনারের নীচের ঘরে সমাপ্ত করেন। একাত্তর সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান বাহিনী শহীদ মিনার ধ্বংস করার সময় ঐ মূল্যবান মুর‍্যালটি নষ্ট করে দেয়। এ-ছাড়া পরিকল্পিত শহীদ মিনারের জন্যে শিল্পী নভেরা আহমেদ তিনটি ভাস্কর্যের কাজও ঐ সময়ে শেষ করেন।

সাতান্ন সালে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্যে হামিদুর রহমান যে পরিকল্পনা করেছিলেন সে সম্পর্কে একাত্তর সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার শহীদ দিবস সংখ্যায় মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর কতৃক শিল্পী হামিদুর রহমানের একটি সচিত্র সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি। "শিল্পী জানালেন, বাসায় থেকে তার পক্ষে মিনারের কাজ করা সম্ভব হবে না। ঠিক হলো মিনারের পাশেই একটা ছোট জায়গায় তিনি থাকবেন। দুটো বেড়ার ঘর বানানো হলো। একটা কাজকর্ম করার কারখানা, আরেক খুপড়ীতে শিল্পী থাকতেন। শিল্পীর ইচ্ছে ছিলো শহীদ মিনারের কাজ করতে যেন চব্বিশ ঘণ্টা এই পরিবেশে থাকা যায়।...এখন আমরা মিনারে চারটি স্তম্ভ দেখছি। প্রত্যেকটি স্তম্ভের ভিতরে লোহার শিক দেয়া রয়েছে। এটা শিল্পীর মূল পরিকল্পনায় ছিল না। পরিকল্পনায় ছিলো এই স্তম্ভগুলোর মধ্যে অজস্র চোখের নকশা থাকবে। লেবু হলুদ আর গাঢ় নীল রং-এর ষ্টেইন্ট গ্লাস-এ তৈরী হবে চোখগুলো ...মিনারের সামনে প্রশস্ত জায়গাতে থাকার কথা ছিলো মার্বেল পাথর।

এই পাথরে ষ্টেইন্ট গ্লাসের বিভিন্ন রঙীন চোখের আলোকিত প্রতিফলন পড়লে সূর্যের সাতরঙা বর্ণালী মেঝেতে সৃষ্টি হতো।—পুরো মিনারটির সামনে একটা রেলিং থাকার কথা ছিল। রেলিংটা আগাগোড়া বর্ণমালা দিয়ে তৈরী হবে। 'একুশে ফেব্রুয়ারী, তোমায় কি ভুলিতে পারি'—এই কথাটা বার-বার রেলিং-এ লেখা থাকার কথা ছিল...যে প্রশস্ত জায়গাটি মিনারের সামনে রয়েছে সেখানে বেশ কিছু রক্তমাখা পায়ের ছাপ শহীদের স্মরণে আর কিছু বিশাল কালো

পায়ের ছাপ দানবের প্রতীক হিসেবে থাকার কথা ছিল।…আর এই মিনারের পাশেই থাকবে একটা বাংলা সাহিত্যের পাঠাগার…সেই পাঠাগারের দেয়ালে তৈলচিত্র থাকবার পরিকল্পনা ছিল।…মিনারের সামনে… কথা ছিল সুন্দর এক ঝর্ণা। চোখের মতো অনেকটা দেখতে হবে এর আকৃতি। কালো বিরাট চোখটাই একটা ঝর্ণা। অনবরত অশ্রুর মতো ঝরবে। সেই পানি আবার জমা থাকবে। মনে হবে যেন মহাকাল থেকে ঝরছে এই অশ্রুধারা। এই ঝর্ণার পর-পরই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটির প্রায় পাঁচিল ঘেঁষে আবার মিনারের মতো একটা উঁচু বেদী উঠে যাবার কথা। যাতে দুই দিকে ঢেউ এর প্রতিক্রিয়া থাকে এবং একটা বিশাল এলাকা জুড়ে শহীদ মিনারের অস্তিত্বটা টের পাওয়া যায়।…মিনার গাত্রে ষ্টেইন গ্লাসের চোখ থেকে মেঝের মার্বেল পাথরে যে বর্ণালীর ছ'টা পড়বে তাতে রঙের একটি কাল্পনিক ঘড়ি খাড়া করা যেতে পারে। যেমনঃ আটটা বাজলে বেগুনী রঙ। বারোটাতে নীল। পাঁচটায় কমলা রঙ। এমনি। দেখতে-দেখতে ঘড়িটার রঙ পরিচিত হয়ে যেত।…আর একটা ঘড়ি থাকার কথা ছিল উঁচু টাওয়ার ঘড়ি…সময়গুলো বাংলা সংখ্যায় লেখা হতো। শহরের একটা প্রধান সময় দেখার কেন্দ্র…মিনারের ঘড়ি একটা দৈনন্দিন অভ্যেসে পরিণত হয়ে যেতো।…এক হাজার স্কোয়ার ফুটের একটি মুর‍্যাল পেইণ্টিং যেটা মিনারের ভিতরের কুঠুরীতে থাকার কথা…যদি এই পেইণ্টিংটা হতো তাহলে এটা পৃথিবীর দীর্ঘতম পেইণ্টিং গুলোর অন্যতম হতো। …পেইণ্টিংটার দুটো স্তরের কাজ মাত্র বাকী ছিল।…''

ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী সাতান্ন সালের নভেম্বর থেকে আটান্ন সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হামিদুর রহমানের তত্বাবধানে শহীদ মিনারের কাজ চলেছিল কিন্তু ~~সাতান্ন~~ সালের মার্চ মাসে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে শিল্পী হামিদুর রহমানকে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে বের করে দেওয়া হয় আর অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে শহীদ মিনারের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আটান্ন থেকে বাষট্টি সাল এই পাঁচ বছর শহীদ মিনারের জন্যে নির্মিত অসম্পূর্ণ বেদীটিই ছিল এ-দেশের শহীদ মিনার, ঐ পাঁচ বছর শহীদ দিবসে মানুষ ওখানেই ফুল দিয়েছে, সভা করেছে, শপথ নিয়েছে। তারপরে বাষট্টি সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর লেঃ জেনারেল আজম খান শহীদ মিনার নির্মাণের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেনকে সভাপতি করে একটি চৌদ্দ সদস্যের

কমিটি স্থাপন করেন। যার সদস্য ছিলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ মমতাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হক, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিম। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এই কমিটির সদস্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটিকে বাষট্টি সালের পহেলা মে'র মধ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ সম্পর্কে তাদের সোপারেশ পেশ করতে বলা হয়। ঐ কমিটি শিল্পী হামিদুর রহমানের সাতান্ন সালের শহীদ মিনারটির মডেল ভিত্তিক সহজ ও ছোট আকারে শহীদ মিনার নির্মাণের যে সোপারেশ করেন সেই অনুসারে কাজ শুরু হয়ে যায় এবং ১৯৬৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হয়। হামিদুর রহমানের পরিকল্পনায় শহীদ মিনারের স্তম্ভে যে চোখের নক্শা থাকার কথা ছিল তার পরিবর্তে সেখানে লোহার শিক গলিয়ে দেওয়া হয়। সূর্যের প্রতিফলন, ঝর্ণা, ঘড়ি, ভাস্কর্য, মুর‍্যাল সব বাদ পড়ে। যাইহোক, তেষট্টি সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে নব-নির্মিত এই শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন শহীদ আবুল বরকতের বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক মাতা হাসিনা বেগম। তেষট্টি থেকে একাত্তর নয় বৎসর ঐ শহীদ মিনারই ছিল এ-দেশের প্রতিটি আন্দোলন, ও সংগ্রামের শপথ গ্রহণ কেন্দ্র। ছেষট্টি সালের ছয় দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন, ঊনসত্তরের আগরতলা মামলা-ভিত্তিক মহান গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের অসহযোগ-আন্দোলনে এ শহীদ মিনার বাঙালীকে দিয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতর সংগ্রামে এগিয়ে যাবার প্রেরণা, এই শহীদ মিনারেই সংগ্রামী বাঙালীর উত্তরণ ঘটেছে স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাই একাত্তরের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যা যুদ্ধ শুরু করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ছাব্বিশে ও সাতাশে মার্চ ভারী গোলাবর্ষণ ক'রে এই শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলি ধ্বংস করে দেয়।

স্বাধীনতার পরে বাহাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশের স্বাধীন মানুষ তার প্রথম শহীদ দিবস পালন করেছিল ঐ ভাঙা শহীদ মিনারেই।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাহাত্তরের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে সভাপতি করে শহীদ মিনার পুনঃনির্মাণের জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি থেকে

শহীদ মিনারের জন্যে কেবল স্থপতিদের কাছ থেকে বাহাত্তর সালের পনেরই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নকশা ও পরিকল্পনা আহ্বান করা হয়। শিল্পী হামিদুর স্থপতি ছিলেন না তাই তিনি বিশিষ্ট স্থপতি এম, এস, জাফরের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি সংস্থা গঠন করে স্বাধীন বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জন্যে সরকারের কাছে নকশা ও পরিকল্পনা পেশ করেন। এই নকশাটি হামিদুর রহমানের সাতান্ন সালের শহীদ মিনারের মূল পরিকল্পনা ভিত্তিকই ছিল। যার ব্যাখ্যা, মিনার এবং তার স্তম্ভ গুলি মাতৃভাষা-মাতৃভূমি তথা মাতা এবং তার শহীদ সন্তানদের প্রতীক। সাতান্ন থেকে একাত্তর সাল চৌদ্দটি বছর ঐ চেতনাই ছিল শহীদ মিনারের রূপকল্প, যা হামিদুর রহমানের সাতান্ন সালের পরিকল্পনায় প্রথম প্রতিফলিত হয়েছিল, যা আংশিক ভাবে হলেও তেষট্টি সালের নির্মিত শহীদ মিনারে উপস্থিত ছিল। নতুন ভাবে শহীদ মিনারের নকশা করতে গিয়ে হামিদুর রহমান সে চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মাতা এবং সন্তানের প্রভীক স্তম্ভ নিয়ে গড়ে ওঠা শহীদ মিনার এদেশের মানুষের চেতনায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিলো। হামিদুর রহমানের বায়ান্ন সালের এই পরিকল্পনাতেও শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলি মায়ের প্রতীক, অর্ধবৃত্তাকারে মাতা তার শহীদ সন্তানদের নিয়ে দণ্ডায়মান, মা অনন্তকাল ধ'রে সন্তানদের রক্ষা করছেন, যাঁরা তার মর্যাদা রক্ষার জন্যে নিজেদের বিসর্জন দিয়েছেন, আর সেই জন্যেই গৌরবান্বিত মা তাদের দোয়া করছেন, সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় মা ঝুঁকে পড়েছেন একটু স্নেহে আর চারটি সন্তানের মধ্য দিয়ে তিনি তার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন। এই পরিকল্পনাতেও মায়ের দৃষ্টির প্রতীক স্তম্ভগুলিতে চোখের নক্‌শা ছিল। স্তম্ভগুলি বিশুদ্ধ শ্বেত মর্মরে চৌদ্দ ফুট উচ্চ মঞ্চের ওপরে স্থাপিত হবে, সিঁড়ি, রেলিং সবই সাদা মার্বেল পাথরে করা হবে, শ্বেত মর্মরে সম্পন্ন সমগ্র মিনারটিতে একটি স্বর্গীয় পবিত্রতা ফুটে উঠবে। স্তম্ভগুলির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য দেবার বিশেষ ব্যবস্থা এবং দু'পাশের বেষ্টনীতে শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবিদের অবিস্মরণীয় স্তবক লৌহ লিপিতে উৎকীর্ণ হবে, বিশেষ আলো ব্যবস্থায় রাতেও মিনার এবং স্তবক সমূহ পরিদৃশ্যমান থাকবে। মিনারের প্রবেশ পথে থাকবে দু'টি ভাস্কর্য এবং দু'টি সিঁড়ি ঘরে ছোট পদ্মপুকুর, ভাস্কর্য দু'টি থেকে অবিরাম পানি প্রবাহিত হবে ঐ পুকুর দু'টিতে। মিনার ছাড়াও পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ছিল ঘড়িঘর, পাঠাগারসহ যাদুঘর, ভাস্কর্যসহ মিনারের চতুর্দিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃজন, মিলনায়তন, শিল্পকলা ইত্যাদি। মোটকথা শিল্পী হামিদুর রহমান এবং স্থপতি জাফর সাতান্ন সালের

শহীদ মিনারের মূল পরিকল্পনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাহাত্তর সালে নতুন করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে শহীদ মিনারের পরিকল্পনা পেশ করেন। দেশের খ্যাতনামা আরো অনেক স্থপতি শহীদ মিনারের জন্য এবারেও তাদের নক্শা ও পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তেহাত্তর সালের পাঁচই মে তারিখে বাংলাদেশ সরকারের ওয়ার্কস সচিবের দফ্তরে এক সভায় জানান হয় যে, স্থপতি এম, এস, জাফর এবং শিল্পী হামিদুর রহমান কৃত শহীদ মিনারের নকশা ও পরিকল্পনা সরকার চূড়ান্তভাবে অনুমোদন এবং গ্রহণ করেছেন। সরকার ও তাদের মধ্যে শহীদ মিনার পুনর্নির্মাণের জন্য একটি চুক্তিপত্রের খসড়াও চূড়ান্ত হয় এবং তা তেহাত্তর সালের ৭ই ডিসেম্বর ওয়ার্কস সচিবের কাছে পেশ করা হয়, কিন্তু তার পরে আর ঐ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ইতিমধ্যে অর্থাৎ তেহাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর আগে 'বাংলাদেশ সরকারের' 'সি এন্ড বি' বিভাগ ইয়াহিয়া টিক্কা বাহিনীর ধ্বংস করা শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলি তাড়াহুড়ো করে নির্মাণ করেন, যে শহীদ মিনার এখন পর্যন্ত বিরাজ করছে। জোড়া তালি দিয়ে নির্মিত এই শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলি পূর্বতন মিনারের স্তম্ভগুলির চেয়ে উচ্চতায় খাটো এবং সামনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়া। সবটা মিলিয়ে এই মেরামত করা শহীদ মিনারের মঞ্চ ও স্তম্ভগুলির আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালী জাতির স্বপ্ন ও কল্পনার শহীদ মিনার আজো বস্তবে রূপায়িত হয়নি, কবে হবে কে জানে ? পাঁচাত্তর সালের আগষ্টের পর থেকে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের সামনের অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা এবং পেছন ও দুই পাশের অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে। এক মহান স্বপ্নের কি অবমাননাকর ও করুণ পরিণতি ?

ভাষা শহীদের চূর্ণ বিচূর্ণ মস্তিষ্ক একুশে ফেব্রুয়ারী বায়ান্ন

সৌজন্যে আমানুল হক

ভাষার শহীদ রফিকউদ্দিন

ভাষার শহীদ আবুল বরকত

সৌজন্যে বেতার বাংলা

ভাষার শহীদ শফিউর রহমান

প্রথম শহীদ মিনার তেইশে ফেব্রুয়ারী বায়ান্ন

সৌজন্যে জামিল চৌধুরী

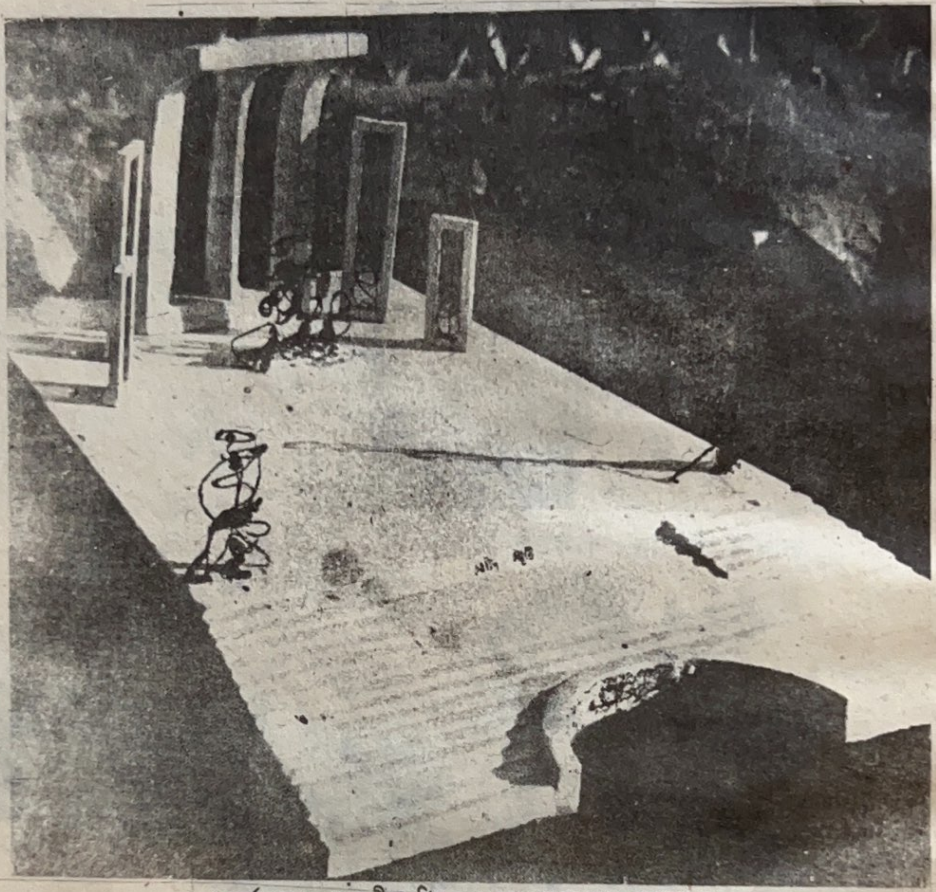

বর্তমান শহীদ মিনারের নক্‌শা সাতান্ন

শহীদ মিনার প্রকোষ্ঠে ভাষা আন্দোলনের ম্যুরাল সাতান্ন-আটান্ন

শিল্পী হামিদুর রহমান

শহীদ মিনার তেষট্টি—একাত্তর

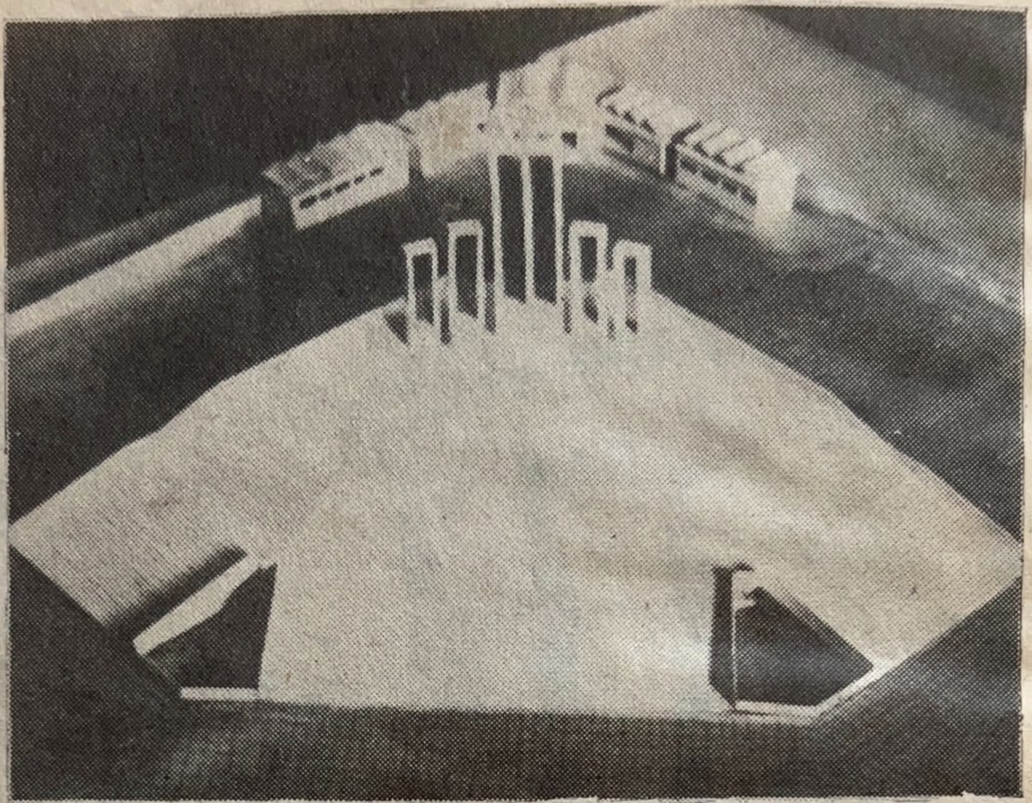

শহীদ মিনারের পরিকল্পনা বাহাত্তর
শিল্পী হামিদুর রহমান ও স্থপতি এম এস জাফর

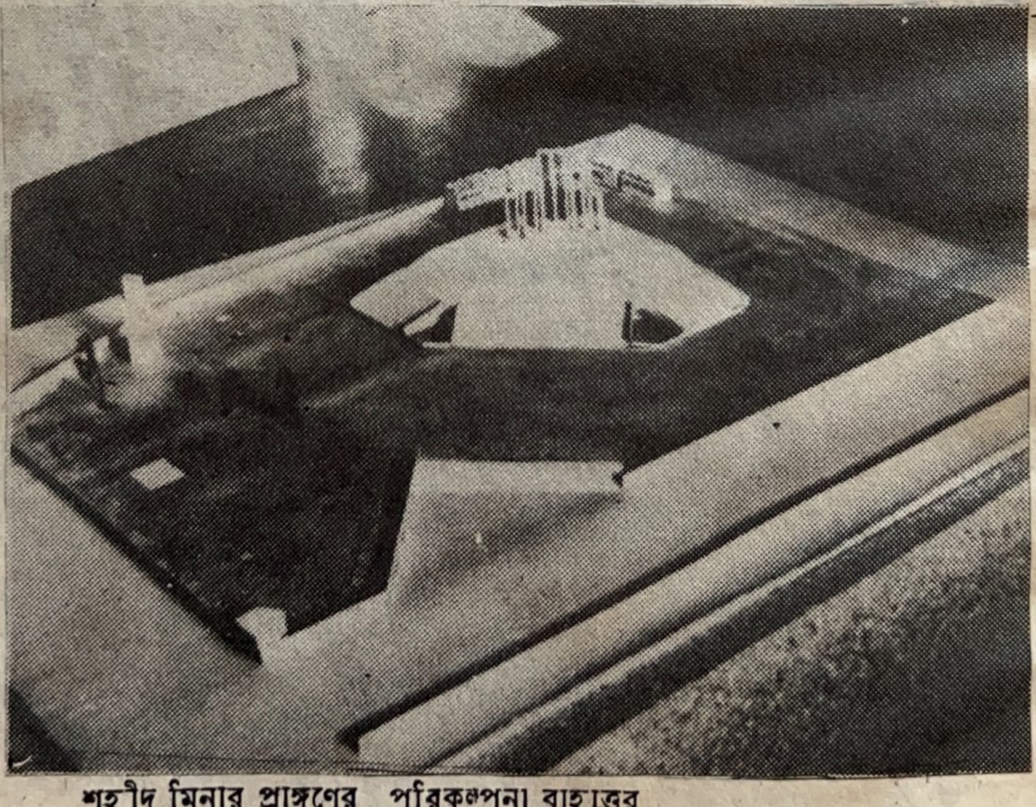

শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের পরিকল্পনা বাহাত্তর
শিল্পী হামিদুর রহমান ও স্থপতি এম এস জাফর